# বদর থেকে বালাকোট

বদরুজ্জামান

# বদর থেকে বালাকোট

(ইতিহাসের রাজসাক্ষী)

বদরুজ্জামান

আহ্সান পাবলিকেশন
কাটাবন □ বাংলাবাজার □ মগবাজার

**বদর থেকে বালাকোট (ইতিহাসের রাজসাক্ষী)**
**বদরুজ্জামান**
**গ্রন্থস্বত্ব : লেখক**

**প্রকাশক**
**মুহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার**
আহ্সান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

**প্রকাশকাল**
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০১১
রবিউল আউয়াল, ১৪৩২
ফাল্গুন, ১৪১৭

**প্রচ্ছদ**
নাসির উদ্দীন

**কম্পোজ ও মুদ্রণ**
র‍্যাক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৯৬৬৩৭৮২

**মূল্য : একশত বিশ টাকা মাত্র**

---

**Badar Theke Balacot** by Badruzzaman Published by Ahsan Publication Kataban Masjid Campus, Dhaka First Edition February, 2009, Second Edition February, 2011 Price Taka-120.00 only.

# লেখকের কথা

'বদর থেকে বালাকোট'– ইসলামের ইতিহাসের রক্তাক্ত সংগ্রামের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। যা সংক্ষিপ্ত পরিসরে কয়েকটি অধ্যায়ে এ বইয়ে আলোচিত হয়েছে।

বইটি লেখার ব্যাপারে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আমার আবাল্য লেখালেখির দীক্ষা গুরু অধ্যাপক এস. এম. হারুন-উর-রশীদ। তাঁর অকৃত্রিম সহযোগিতা ও সান্নিধ্য এ গ্রন্থ রচনার জন্য মুখ্য ভূমিকা রাখে।

আমার মাধ্যমিক স্কুল জীবনের শিক্ষক শামসুর রহমান সাহেবের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাও উল্লেখ করার মতো।

দেশের মফস্বল শহর সাতক্ষীরা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আলোর পরশ' পত্রিকায় লেখাটি ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছে। এজন্য সম্পাদক আলতাফ হোসেনকে ধন্যবাদ জানাই। এরপর বই আকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা জাগে। এজন্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অনেক সময় পার হতে থাকে। এ সময় উষ্ণ সাহায্যের হাত বাড়ায় স্নেহভাজন ছাত্র, তরুণ কবি মোঃ আবুল হোসেন। যোগাযোগ হয় প্রকাশনার সাথে। এজন্য আমি তার কাছেও কৃতজ্ঞ। স্নেহভাজন ছাত্র হযরত আলী, সালাহ উদ্দিন আহমেদ প্রমুখরাও আমাকে সব সময় প্রেরণা ও সাহস দিয়েছে। তাই তাদেরকেও ধন্যবাদ।

বইটি আহসান পাবলিকেশন থেকে বের হয়েছে। তাই গোলাম ছরওয়ার ভাই-এর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

**বদরুজ্জামান**
২৫/১০/২০০৮

জাফরপুর, তারালী
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

## তোহ্ফা

আমার শ্রদ্ধেয়
আব্বা আম্মাকে

## এক

সময় পার হলো। একটি একটি বছর, যুগ, শতবর্ষ। ছ'শ বছর পেরিয়ে গেলো। নবী ঈসা রুহুল্লাহর (আ.) অন্তর্ধান হয়েছে। সত্যের আলো ম্লান হয়ে এলো, ধীরে ধীরে। মিথ্যে আর অবিশ্বাসের অন্ধকারে ছেয়ে গেলো ধরার মধ্যভাগ। আরব, প্যালেস্টাইন, তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য– সবখানেই।

সত্যের আলো নিয়ে এলেন মহানবী মুহাম্মদ (সা.)। পুণ্যভূমি মক্কায়। মিথ্যাচার, অজ্ঞতা, লৌকিক ধর্মে বিশ্বাস, নরহত্যা, রাহাজানি সব পাপই সেখানকার মানুষকে ঘিরে ধরেছে। হৃদয়ের অন্ধকার আর অবিশ্বাসের কালো দেয়ালের ভিড়। সেই অশুভ আবহে কাটলো তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন।

তিনি যা যা চাইলেন তার সবটাই পেলেন না। মানুষের মধ্যে প্রভুর শাশ্বত বাণীকে কর্মে, চিন্তায় ও আদর্শে সঞ্চারিত করতে চাইলেন। কিছুটা হলো, পুরোটা হলো না। 'তাওহিদী বিশ্বাস' সবচে' বড় বাধা হয়ে দাঁড়ালো। পূর্ব পুরুষের ধর্মের আচার-বিশ্বাস থেকে সরিয়ে আনা সহজ হলো না। কোনো যুগেই তা হয়নি। পুরোনো বিশ্বাসের ওপর যাঁরা নতুনের আলো ছড়ান, তারাই মার খান, অপদস্ত হন, বার বার। ইতিহাস তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মক্কার অবিশ্বাসীরা বাধ সাধলো। সে বাধা বড় শক্ত। তাঁর অনেক রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ও এর মধ্যে ছিলো। সমাজপতি, যোদ্ধা, কবি, ধনবানরা তো ছিলোই। আর তাঁর সাথী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তো অনেকটা অসহায়, সংখ্যায় কম, পেশায়, অর্থে ও বংশ-গৌরবে অপ্রতুল। দু'একজন ওমর-হামজা-আবু বকরের কথা বাদই দেয়া যায়।

দিন যায়, রাত আসে।

সপ্তাহ, মাস ঘুরে বছরও পার হয়।

সময়ের সাথে দাওয়াতের কাজ এগিয়ে চলে। বাধা আরো বেশি হয়। আবু জেহেল, আবু লাহাব, উমাইয়া, ওতবা, শাইবারা আরো ক্ষিপ্ত হয়, রুষ্ট হয়।

সহজে সহজে এ পথ থেকে সরে দাঁড়াবার জন্যে অনেক আকাশ ছোঁয়া প্রলোভন দেখায় নবীকে। অতুল ধন সম্পদ, অনিন্দসুন্দর আরব রমণী এমনকি আরব গোত্রগুলোর সেরা সর্দারের পদও দিতে চাইলো। কেবল একটাই দাবি 'নতুন তাওহিদী মতবাদ প্রচার করা যাবে না'। নবী এ পথে গেলেন না। সব রাজসিক উপকরণ পায়ে ঠেলে দিলেন।

এবার আরো শক্ত হলো প্রতিপক্ষরা। অত্যাচারের পথ বেছে নিলো তারা। শেষ উপায় তাদের। নবী (সা.), তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের ওপর এলো অমানবিক নির্যাতন। রক্তাক্ত হলো শরীর। চাচা আবু তালিবসহ অন্তরীণ হলেন। দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব-অনটনে কেটে গেলো কয়েকটি দুঃসহ বছর। সামাজিকভাবে নিগৃহীত হলেন নবী, তাঁর পরিবার ও সাহাবারা।

পার হলো এক এক করে মক্কার তেরোটি বছর। জন্মভূমি তাঁকে আর কাছে রাখতে পারলো না। আপনজনেরা অনেকেই পর হয়ে গেলো। রক্তের বন্ধন ছিন্ন হলো।

অনেক আগেই তিনি হিজরত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে স্বপ্ন সত্য হয়ে জেগে উঠলো। তাওহীদের যে আলো ছড়াতে তিনি এসেছেন, তার পূর্ণতা পিতৃভূমিতে হলো না। মদীনা মোনাওয়ারা তাঁকে যেনো হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এ আহ্বানে বিশ্বাস ছিলো, মায়া-মমতা ছিলো, ছিলো ভালোবাসার হৃদয় ছোঁয়া আলিঙ্গন। তিনি সাড়া দিলেন।

ইসলাম রাষ্ট্রীয় শক্তিতে রঞ্জিত হবার জন্যে মদীনাই উপযোগী ক্ষেত্র। সত্য ধর্ম মানুষের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠা করতে হলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যে একান্তই দরকার– এ দুর্লভ অনুভূতি নবীর (সা.) হৃদয়ে সাড়া জাগালো। মহাপ্রভুও যেনো তাঁর কানে কানে সে কথারই প্রতিধ্বনি শোনালেন ঃ

"বলুন, হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮০)

## দুই

ঈসায়ী ছ'শ' বাইশ।

সেপ্টেম্বরের এক রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুর।

আজও এসেছিলো কোবার নও-মুসলিমরা। অপেক্ষার পর অপেক্ষা। তারপর যে যার কাজে চলে গেলো তারা। বিশ্বনবীকে (সা.) দু'চোখ ভরে দেখতে পেলো না। আজও।

দিগন্ত জোড়া ধু-ধু মরুভূমি। নীল আকাশ ধূসর প্রান্তর ছুঁয়ে আছে। নিশ্চল, নিস্তব্ধ সে প্রান্তর। বালি আর বালি। রোদে চিকমিক করছে। নিদাঘ-দুপুরের অবসন্নতা যেনো প্রকৃতির শরীরে।

এ সময়ই দূরে দেখা গেলো দু'জন উষ্ট্রারোহীকে। মদীনার এক ইহূদী তা দেখলো। সে জানতো এ মহামানবের আসার খবর। দূরের এই দুই আগন্তুক কে আরো স্পষ্ট চেনার জন্যে সে তার বাড়ির ছাদে উঠলো। দেখলো সে। তার অবিশ্বাসের পাথরে আঘাত লাগলো। ভেঙ্গে খান খান হলো। 'সত্যিই মুহাম্মদ' আজ তাদের দ্বারপ্রান্তে। কল্পনার কল্পলোক থেকে বাস্তবের কঠিন আলোয় আলোকিত হলো তার হৃদয়। সে মুহূর্তের মধ্যে উচ্ছ্বাসিত হলো। ডাক দিলো মদীনাবাসীকে ঃ

'তোমরা এসো। বেরিয়ে এসো ঘর থেকে।' তোমাদের কাঙ্ক্ষিত জ্যোর্তিমান পুরুষ আজ তোমাদের দ্বারে উপস্থিত।'

সাড়া পড়ে গেলো সবার মধ্যে। মুসলমানরা বেশি আনন্দিত হলো। তারা এগিয়ে এলো, মহানবীকে বরণ করে নিতে। এলো সবাই– নারী, পুরুষ, শিশু, কিশোর, অশীতিপর বৃদ্ধ, সবাই। তারা স্বাগত জানালো নবী ও তাঁর সহচরকে। খোশ আমদেদ। আহলান–সাহালান। হে নবী, স্বাগতম– শুভেচ্ছা।

উট কাসওয়াকে ঘিরে ধরলো তারা। নবীও (সা.) হাসিমুখে তাদের সংবর্ধনার জবাব দিলেন।

কী জ্যোর্তিময় চেহারা! রক্তিম অভায় উজ্জ্বল তাঁর শরীর। কালো চোখ।

সুন্দর, সুদর্শন কপাল। পুষ্ট হাত ও পা। ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা। এমন সুন্দর মানুষ মদীনাবাসী এর আগে কখনো দেখেনি।

আবু বকর (রা.) ও তিনি উট থেকে নামলেন। এগিয়ে গেলেন সামনে। সাথে সাথে চললেন আনসাররা। আনন্দের মিছিল। মুখে তাদের 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি। হৃদয়ে তাদের মহামিলনের শপথ।

কোবা মদীনা হতে তিন মাইল দূরের এক উর্বর পল্লীভূমি। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। ফলের বাগান, আঙ্গুর-কমলা-আপেল ফলের সমারোহ, কোথাও বা সুসজ্জিত ফুলের বাগিচা।

ইতোপূর্বে ইসলাম কবুল করেছিলো এখানকার বেশি কয়েকটি পরিবার। এদের মধ্যে আমর ইবনে আওয়াফের পরিবারটিই সবচে' সম্ভ্রান্ত। কুলসুম ইবনে হাদাম এ খান্দানেরই প্রধান। মহানবী (সা.) কোবাতে তাঁরই মেহমান হলেন। তিনি এখানে থাকলেন দীর্ঘ চৌদ্দ দিন। মসজিদ বানালেন, ইসলামের বিধি-বিধান শিখালেন মুসলমানদের। তারপর প্রবেশ করলেন মদীনা নগরীতে।

মদীনা মোনাওয়ারা। অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ এক নগরী। প্রাকৃতিক পরিবেশও বড়ই মনোরম। নানা রকম ফল-ফুলের বাগান আর গাছ-গাছালিতে ঘেরা এ নগরীর অপরূপ সৌন্দর্য মানুষকে কাছে টানে, আকর্ষণ বাড়ায়।

মদীনা এক জনাকীর্ণ কোলাহল–মুখরিত জনপদ। নানা দল, মত ও ধর্মের মানুষের বাস এখানে। খ্রিস্টান, পৌত্তলিক, অগ্নিপূজক, ইহুদীরা তো আছেই। এদের কারো সাথে কারো আদর্শ ও আচারের কোনো মিল নেই। ভিন্ন আদর্শ, ভিন্ন সভ্যতা–সংস্কৃতি, ভিন্ন জীবন যাত্রা। সুসম্পর্কও নেই একে অন্যের সাথে, আছে শুধু শত্রুতা ও সংঘর্ষ। এমনি পরিবশে আবার যোগ হয়েছে ইসলামের অনুসারীরা।

মহানবী (সা.) বুঝলেন, এখানে ইসলামের ভিত সুদৃঢ় করতে সবাইকে একীভূত করতে হবে, আনতে হবে একই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায়। তাই তিনি মদীনাকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা দিলেন। প্রবর্তন করলেন কুরআনের শাসন। রচিত হলো সংবিধান। পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান।

এতে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিধান নিশ্চিত হলো। দেয়া হলো প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার।

তৈরি হলো অনুকূল পরিবেশ। নতুন বেশ ধারণ করলো ইসলাম। কোনো ভয় নেই, বাধা নেই, আছে শুধু স্বাধীনতা। তাই স্বাধীনভাবে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করার সুযোগ পেলেন মুসলিমরা। দিনে পাঁচ বার মসজিদের মিনার থেকে উচ্চ স্বরে ভেসে আসে আযানের মধুর ধ্বনি। সবাই কাজ ফেলে মসজিদে যায়, নামায পড়ে নিষ্ঠার সাথে। নামায শেষে আবার প্রত্যেকে বেরিয়ে পড়ে নিজ নিজ কাজে। ইসলামের প্রচার-প্রসারেও আর কোনো বাধা নেই। তাই সত্যের আলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো মদীনার চারদিকে।

ইসলাম প্রচারের সাথে নতুন রাষ্ট্রের ভিত নির্মিত হলো। মহানবীই (সা.) হলেন এই রাষ্ট্রের মহান স্থপতি। আরব মরুর প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান।

## তিন

নতুন পরিবেশে এসেও শঙ্কা মুক্ত হলেন না মহানবী (সা.)। একে একে তিন-তিনটি বাধার দেয়াল তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। যা তাঁর আগামী দিনের স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে রূপ দিতে চাইলো।

এ তিনটি বাধা হলো, মদীনার মোনাফিক, ইহূদী আর পিতৃভূমি মক্কার কুরাইশরা। কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে এ তিন শক্তি তাঁর সামনে একটু একটু করে বাধার প্রাচীর গড়ে তুললো।

বিষয়টা আলাদা করে গুছিয়ে বলা যায়। মদীনার আউশ ও খাজরাজ গোত্রের অনেকেই প্রতিবেশী আনসারদের মতো ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু ইসলামের ওপর এই আত্মসমর্পণ আন্তরিক ছিলো না। কেবল পরিবেশ ও বাস্তব পরিস্থিতির তাকিদে ইসলামকে মেনে নেয়া, কিন্তু পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি তারা। হৃদয়ের আকর্ষণ ও ঐশী প্রেমের অলৌকিক আবেগ তাতে ছিলো না। দৃশ্যতঃ এরা পোশাকে-পরিচ্ছদে, আনুষ্ঠানিকতায় মুসলমানদের রীতি-পদ্ধতি মানলেও বিশ্বাস ও আন্তরিকতায় তা শূন্য। এরা মোনাফিক, ছদ্মবেশী দল। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এদের দলপতি। তার

উচ্চাভিলাষ তাকে অবিশ্বাসের তুঙ্গে তুলেছিলো। সে চেয়েছিলো মদীনার মানুষদের নেতৃত্ব দিতে, রাজতিলক কপালে পরতে। আর তাই দিনে দিনে নবাগত নবীই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো। লোভ ও আকাঙ্ক্ষার জোয়ারে সে ভেসে গেলো। অবিশ্বাসের কালো ছায়ায় আবৃত হলো তার অশান্ত, অতৃপ্ত অন্তর। সে সংঘবদ্ধ হলো নবীকে বিলীন করে দিতে।

দ্বিতীয় বাধা এলো মদীনার ইহুদীদের তরফ থেকে। মহাপ্রভু এ জাতির ওপর অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, কিন্তু তাদের বিপদগামিতা রোধ করতে পারেননি। কোনো কোনো নবীকে তারা হত্যাও করেছিলো, তাঁদের অমিয়-ঐশী বাণী প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

শেষনবী মুহাম্মদের (সা.) আগমনের সংবাদ তারা পেয়েছিলো। তাওরাতেও সে সংবাদ উল্লেখ ছিলো। কিন্তু হঠকারিতা ও অহমিকায় তারা নবীকে অস্বীকার করে বসলো। কেননা, মুহাম্মদ ইসরাঈল বংশে জন্মান নি, কুরাইশ বংশে জন্মিয়েছেন, তাই। মক্কা তাঁর জন্মস্থান হবে কেনো– এই সন্দেহের বাতিক তাদের অন্ধকার হৃদয় ছুঁয়ে গেলো। তাই তারাও লেগে গেলো নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে। ইসলাম প্রচারে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইলো তারা-ও।

এসব সুযোগ হাতছাড়া করতে পারলো না মক্কার কুরাইশরা। মুহাম্মদ (সা.) তাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে থাকলেও, সে দূরত্ব এমন দূর নয়। নতুন ধর্ম ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে মোনাফিক ও ইহুদীদের সংগে যোগাযোগ করলো, আতাত গড়ে তুললো। যা প্রকৃতির নিয়মেই হয় ঃ শত্রু'র শত্রু অর্থই হলো মিত্র। নিজের লোক, আপনজন।

নবীজী এসব যোগসাজশ ও পরিকল্পনার সব খবরই পেলেন। এর প্রতিরোধের জন্যেও তৎপর হলেন, বসলেন সাহাবীদের নিয়ে। অনিবার্য হয়ে উঠলো জিহাদ। যা প্রতিশোধের চেয়ে প্রতিরোধের দিকটাই বেশি জরুরি হয়ে পড়ে। তাঁর সিদ্ধান্তের অনুকূলে মহাপ্রভুও সায় দিলেন। কুরআনের আয়াতে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেলো ঃ

“আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। তবে সীমালঙ্ঘন করো না। কারণ, আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।” (সূরা বাকারা ঃ ১৯১)

"এবং তাদের যেখানে পাও হত্যা করো এবং যেখান হতে তারা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে সেখান হতে তুমিও তাদের তাড়িয়ে দাও।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯২)

এতে তিনি সাহস পেলেন। জিহাদের রক্তজয়ী আকাঙ্ক্ষায় দীপ্ত হলো তাঁর অন্তর। এমনি সময়ে ঘটলো এক অঘটন। মক্কার কুরাইশরা মদীনার উপকণ্ঠে এসে হামলা করলো। লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলো অনেক কিছু।

কুরাইশদের দুরভিসন্ধি তাঁর বুঝতে আর বাকী রইলো না। তিনি আটজন সাহাবীর একটি ছোট্ট গোয়েন্দা দল পাঠালেন মক্কার কাছাকাছি সীমানায়। দলপতি আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ। সেখানে কুরাইশদের চারজনের একটি দলেরসাথে তাঁদের সংঘর্ষ হলো। নিহত হলো কুরাইশ প্রতিপক্ষের একজন। নবীজী তাদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দেননি কেননা, সে সময় ছিলো অত্যন্ত পবিত্র সময়, রজব মাস। যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা, জখম নিষিদ্ধ। নিহতের নাম অমর ইবনে হাদরামী। তাঁর রক্তের বদলা নিতে কুরাইশরা বদ্ধপরিকর হলো।

কুরাইশরা মদীনা আক্রমণের আয়োজন করছিলো অনেক আগে থেকেই। মহানবীর (সা.) মদীনায় হিজরতের সাথে সাথেই। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম কেনার জন্যে তাই আবু সুফিয়ানকে পাঠিয়ে ছিলো সিরিয়ায়। এখন তার ফেরার সময়।

আবু সুফিয়ানের সংগৃহীত অস্ত্র দিয়েই আঘাত করা হবে মদীনার মুসলমানদের। আর সে অস্ত্র সম্ভারও আসবে মদীনার সীমানা দিয়ে। মহানবী (সা.) এ সবকিছু জেনে প্রতিরোধের জন্যে তিনশ' তেরো জনের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললেন। উদ্দেশ্য আবু সুফিয়ানকে বাধা দেয়া, শাণিত অস্ত্র দিয়েই তার মোকাবিলা করা।

দ্বিতীয় হিজরী।

রমযানের প্রথম দিক। শুক্লাপক্ষের রজনী। সারা মক্কা শহর ঘুমাচ্ছে, অচেতন সবকিছু ঃ মানুষ, ঘর-গৃহস্থালি, পথ, খেজুর গাছ, বালুময় প্রান্তর। আব্দুল মোত্তালিবের কন্যা আতিকাও ঘুমাচ্ছেন, অঘোরে। ঘুম জড়ানো চোখে তিনি স্বপ্ন দেখলেন ঃ

'মক্কার পাশের সমতল ভূমিতে এসে নামলো এক উট সওয়ার। সে উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বললো, 'হে কুরাইশরা, তিন দিনের মধ্যে মৃত্যুর জন্যে

তৈরি হয়ে যাও। তখন বহু লোক সমবেত হলো তার পাশে। তারপর সে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলো। লোকজনও তার পিছু পিছু ঢুকলো। যখন সবাই তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, তখন সহসা তার উটটি তাকে নিয়ে কাবার ভেতরে গেলো। তারপর সে আবার চিৎকার করে বললো, 'হে কুরাইশরা, তিন দিনের মধ্যে মৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়ে যাও; হুঁশিয়ার। তারপর তার উটটি তাকে নিয়ে আবু কুবাইস পর্বত শিখরে আরোহণ করলো। তারপর সে আবার চিৎকার করে একই কথা ঘোষণা করলো। অতঃপর সেখান থেকে বড় একটা পাথর গড়িয়ে দিলো। পাথরখানা গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের পাদদেশে পড়তেই টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। তার কোনো না কোনো টুকরো মক্কার প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে পড়লো।'

(সীরাতে ইবনে হিশাম, অনুবাদ ঃ আকরাম ফারুক, পৃ. ১৫২)

আতিকার এ স্বপ্নের কথা ছড়িয়ে পড়লো সবখানে। কুরাইশদের মুখে মুখে তা উচ্চ-অনুচ্চ স্বরে বর্ণিত হলো। ওয়ালীদ, ওতবা ও আবু জেহেলরা এ স্বপ্নকে কেবল স্বপ্নই মনে করলো। তা যে বাস্তবে তাদের জন্যে দুঃস্বপ্ন ছিলো তা তারা মেনে নিলো না। বরং এ নিয়ে তারা হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলো। অল্প সময়ের মধ্যেই এলো সিরিয়া থেকে মক্কার পথে আসা আবু সুফিয়ানের দূত। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো সে কুরাইশ দলপতিদের কাছে। বললো সত্য সংবাদ ঃ

"আমার কাফেলাকে আক্রমণ করার জন্যে মুহাম্মদ সসৈন্যে বদরে উপস্থিত। মক্কা হতে যথেষ্ট সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র না পাঠালে উপায় নেই।"

এ সংবাদে উত্তেজিত হলো কুরাইশ দলপতিরা। জরুরি বৈঠকে বসলো তারা। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো মদীনা আক্রমণের।

তখন দিনের শেষ সূর্য রশ্মিও নিভে গেছে। পশ্চিম আকাশের আবির মাখানো রঙ ছড়িয়েছে। সে রঙে রক্তের আভা দেখা যায়। আঁধার ছড়িয়েছে মরু প্রান্তরে। নিঃসীম সে আঁধার। এ সময়ই তারা সংগ্রহ করলো এক হাজার সজ্জিত সৈন্য। অস্ত্রশস্ত্র-রসদপত্র। অশ্ব, উট, গায়িকা, নর্তকীও চললো সেই সাথে। মুসলিমদের মদীনা থেকে মুছে দেবার শপথ নিয়ে এগিয়ে চললো তারা।

## চার

মক্কার অবিশ্বাসীদের শরীরে শিহরণ জাগায় দু'টো শব্দ ঃ মুহাম্মাদ (সা.) ও মদীনা। মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় তাই মদীনার ওপর রাগ ও ক্ষোভ। একে ধ্বংস করে দেয়াই তাদের অভিলাষ। আর তাই তো আবু সুফিয়ানকে যুদ্ধের উপকরণ কিনতে পাঠানো হয়েছিলো সিরিয়ায়।

আবু সুফিয়ান ফিরে আসছে অস্ত্রের বহর নিয়ে। দীর্ঘ সারির সে কাফেলা। উত্তরে/দক্ষিণে মক্কা থেকে ধেয়ে আসছে সশস্ত্র কুরাইশরা। তারা চেয়েছিলো আবু সুফিয়ানকে বিপদমুক্ত করতে, আর সেই সাথে মদীনা আক্রমণ করতে। 'মদীনাতুল ইসলাম'কে একেবারে মুছে নিতে চায় তারা।

চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন মহানবী (সা.)। কী করবেন তিনি! তিনি সরাসরি কুরাইশদের মুখোমুখি হতে চাননি। চেয়েছিলেন আবু সুফিয়ানের অস্ত্র-কাফেলাকে বাধা দিতে। কেননা, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার মতো সমরসজ্জা তাঁর নেই। সাহাবীদের সংখ্যাও কম। মহাপ্রভু এ সময় জানিয়ে দিলেন তাঁর প্রিয় নবীকে (সা.) ঃ

'দু'টি দলের মধ্য থেকে একটি তোমরা পেয়ে যাবে।' (সূরা আনফাল ঃ ৭)

এই ঐশী বাণীতে আশার সঞ্চার হলো। ভবিষ্যবৎ তাঁর সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠলো। তাঁর হৃদয় হলো শক্ত, দৃঢ়। অমিত তেজে বলীয়ান হলেন তিনি। হক ও বাতিলের চূড়ান্ত ফয়সালা। তিনি রুখে দিতে চাইলেন কাফেরদের অভাবিত স্পর্ধা।

সময়ের দাবিও ছিলো তাই। তা না হলে ইসলামী আন্দোলন নিষ্প্রাণ হয়ে যাবে। বেড়ে যাবে কুরাইশদের দৌরাত্ম্য। আরবের প্রতিটি বিরোধী গোত্র এমনকি অবিশ্বাসীদের শিশুরাও ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ভয় পাবে না।

মহানবী (সা.) সমবেত করলেন সাহাবীদের। পরামর্শ বিনিময় হলো। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন তিনি। আবু সুফিয়ানের কাফেলার পরিবর্তে কুরাইশ সেনাদলের মোকাবিলা করা হবে।

আবু সুফিয়ান মুসলিম বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে মক্কার পথে পাড়ি দিয়েছিলো। মুসলিমদের নাগালের বাইরে গিয়েই সে খবর পাঠালো ঃ

'আমার কাফেলা বিপদমুক্ত। এখন
সবার ফিরে আসা উচিত।'

কুরাইশ নেতাদের অনেকই গোড়া থেকে যুদ্ধ যাত্রায় আগ্রহী ছিলো না। তবু তাদের আসতে হয়েছে। নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এখন আবু সুফিয়ানের দেয়া সংবাদে ফিরে যেতে চাইলো তারা। যুহরা ও আদী গোত্রের নেতারা বললো ঃ 'তাহলে এখন আর যুদ্ধের দরকার নেই।'

এই বলে ফিরে চললো তারা।

কিন্তু আবু জেহেল কোনো মতেই তাদের সাথে একমত হলো না। নিজের বাহাদুরী ও অবস্থান সুদৃঢ় করতে চাইলো সে। বললো ঃ

"আল্লাহর কসম, বদর পর্যন্ত না পৌছে ফিরবো না আমরা। ওখানে তিন দিন থাকবো, উট জবাই করবো, মদ খাব আর মেয়েরা তুষ্ট করবে আমাদের। এই বীরত্বের কথা আবহমান কাল ধরে আরবরা স্মরণে রাখবে।"

এদিকে মুসলিম বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললেন মহানবী (সা.)। মদীনা থেকে আশি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর প্রান্তরে এসে পৌছালেন তিনি। দেখলেন কুরাইশ বাহিনী আগেই এসে অবস্থান নিয়েছে।

বদর প্রান্তরের দক্ষিণ ভাগের জায়গাটি সুন্দর ও সুবিধাজনক। এখানেই শিবির স্থাপন করেছে তারা। জমাট মাটি থাকার কারণে তাঁবু খাটানো-ও সহজ হয়েছে সেখানে। কিন্তু মুসলমানদের স্থানটি ছিলো বালুকাময়। একটি কূপ পর্যন্তও নেই সেখানে। নবীজী (সা.) তাঁর সৈন্যদলকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। উত্তর দিকের আক্বিশ পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপন করলেন তিনি। আল্লাহর রহমত বর্ষিত হলো এখানে। বৃষ্টি এলো মুষল ধারায়। মুসলিমরা সে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করলেন, সাথে সাথে। তৈরি করলেন জলাধার।

মুসলিম বাহিনী হিজাজের বন্ধুর পথ পায়ে হেঁটে এসেছে। এ কারণে তারা ছিলো খুবই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন ছিলো তাদের। মহান আল্লাহ সে সুযোগ করে দিলেন। বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হলো পরিবেশ।

সারা রাত ধরে সকল সাহাবী ঘুমালেন, অঘোরে। কেবল ঘুমাতে পারলেন না মহানবী (সা.)। সারা রাত জেগে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন তিনি।

রমযানের সতর। শুক্রবার। ভোর বেলা। মরু প্রকৃতি তখনো সাদা চাদরে ঢাকা। পূবাকাশে সূর্যটা স্পষ্ট হয়নি। ঘুম ভাঙ্গেনি মানুষের। এমনি সময় 'আকনকল' টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো কুরাইশ বাহিনী। যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সহস্রাধিক সৈন্য। রণাঙ্গনে সারি বেধে দাঁড়ালো তারা। অপেক্ষা করতে লাগলো সেনাপতির ইশারার। একটি মাত্র ইঙ্গিত। তারপরই হিংস্র শার্দুলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর ওপর।

এদিকে মাত্র তিনশ' তেরো জন মুসলিম সৈন্য। ঈমানের বলে বলিয়ান তারা। পাহাড়ের মতো অটল, অচল। চোখে তাদের কোনো অস্থিরতা নেই। শান্ত, অচঞ্চল তাদের অবয়ব। কিন্তু ওই কুরাইশ কাফেররা জানে না, এই অবিচল হৃদয়ে আগ্নেয়গিরির কী আগুন জ্বলছে। যখন সেই বুক ভেদ করে লাভা গড়িয়ে পড়বে, তখন শত্রুদের কোনো চিহ্নই থাকবে না।

রাসূলে খোদা (সা.) নিজে মুসলিম সেনাদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করলেন। রচনা করলেন ব্যূহ। যা ভেদ করে শত্রু সেনারা ভেতরে আসতে পারবে না। তারপর তিনি সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে কিছু নির্দেশ দিলেন ঃ

"মুখে কোনো শব্দ করবে না। চুপচাপ নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে হবে। আমার নির্দেশের আগে কেউ আক্রমণ করবে না। কুরাইশ বাহিনী একেবারে কাছে এসে পড়লে, প্রথমে তীর নিক্ষেপ করবে। আর একদম ওপরে এসে পড়লে তখন তরবারি ব্যবহার করতে হবে।"

এবার নবীজী (সা.) দু'হাত তুলে মোনাজাত করলেন ঃ 'হে রাব্বুল ইজ্জত, তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা আজ পূর্ণ করো। হে মা'বুদ, যদি এই ক্ষুদ্র একত্ববাদী দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তোমার ইবাদত করার জন্য আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।'

রাসূলে খোদার (সা.) এই আকুল আবেদন শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন হযরত আবু বকর (রা.)। তিনি আবেগময় কণ্ঠে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.), আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন।'

এমনি সময় আয়াত নাযিল হলো ঃ "শীগ্‌গিরই (কুফরের) সৈন্যদলকে পরাস্ত করা হবে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে।" (সূরা কামার ঃ ৪৫)

আশ্বস্ত হলেন নবী। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁর চেহারা। তিনি প্রথমে আবু বকর (রা.) কে শুনালেন এই সুসংবাদ। তারপর শুনলেন সব সাহাবী। মুসলমানদের সাহস বেড়ে গেলো শত গুণে।

এখন দুই বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি। একদিকে ইসলাম, অন্যদিকে কুফর। সম্পূর্ণ বিপরীত দুই শক্তি পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

বদর প্রান্তে আজ অভূতপূর্ব দৃশ্য। পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে- পুত্র পিতার বিরুদ্ধে, বন্ধু বন্ধুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। আবু বকর (রা.) পুত্র আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে, কুরাইশ সেনাপতি ওতবা পুত্র হুযায়ফার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। যারা কাফির, খোদাদ্রোহী তাদের রক্তের সম্বন্ধ আজ কোনো কাজে এলো না। একমাত্র ঈমানের সম্পর্কই পরম প্রিয় ও অপ্রিয় হয়ে উঠলো।

সবার আগে কুরাইশদের পক্ষ থেকে আসওয়াদ নামের এক যোদ্ধা মুসলমানদের সংরক্ষিত পানির হাউসের ওপর আক্রমণ করলো। বীর হামযা সাথে সাথে হত্যা করলেন তাকে। এবার ওতবা তার ভাই শাইবা ও ছেলে ওয়ালীদকে নিয়ে এলো। মুসলিম সৈন্যদের উদ্দেশ্যে হুংকার দিলো ঃ

'কার বুকে সাহস আছে, আয়তো'। আনসার সাহাবী হযরত আউফ, হযরত মুয়ায ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহ এগিয়ে গেলেন। ওতবা বললো, 'আমরা এদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই না । আমরা চাই যোগ্য যোদ্ধা।'

রাসূল (সা.) তখন আনসারদের ফিরিয়ে আনলেন। তাঁদের তিনজনের পরিবর্তে পাঠালেন হযরত হামযা, হযরত ওবায়দা ও হযরত আলীকে। মুকাবিলা করতে এগিয়ে গেলেন তাঁরা।

মুহূর্তের মধ্যে হযরত হামযার (রা.) সাথে ওতবার, হযরত ওবায়দার (রা.) সাথে শাইবার এবং হযরত আলীর (রা.) সাথে ওয়ালীদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। কোনো সুযোগ না দিয়ে আলী তলোয়ারের এক আঘাতে ওয়ালীদের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। ওয়ালীদের পরিণতি দেখে ওতবা হামযার ওপর আক্রমণ চালালো। হামযা তার আক্রমণ প্রতিহত করেই প্রতি আক্রমণে ওতবাকে হত্যা করলেন। এদিকে শাইবার তরবারির আঘাতে ওবায়দা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে জমিনে পড়ে গেলেন। সাথে সাথে আলী

গিয়ে শাইবাকে হত্যা করলেন। তারপর আহত ওবায়দাকে কাঁদে করে রাসূলের (সা.) কাছে নিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি শহীদ হলেন।

পর পর চারজন অমিততেজী যোদ্ধার মৃত্যুতে দারুণ হতাশ হলো কুরাইশরা। এরপর মল্ল যুদ্ধে আসতে আর সাহস পেলো না তারা। সমবেতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো মুসলিম বাহিনীর ওপর।

তুমুল যুদ্ধ বেধে গেলো। অস্ত্রের সংঘর্ষে আগুনের ফুলকি ছুটতে লাগলো। মুসলিম সৈন্যদের গগণ বিদারী 'আল্লাহ আকবর' নিনাদ আর কাফিরদের মৃত্যু চিৎকারে থর থর করে কেঁপে উঠলো বদর প্রান্তর। ছোট্ট দুই কিশোর যোদ্ধা– মুয়াজ ও মুয়াওবিজ এর হাতে নিহত হলো কুরাইশ দলপতি আবু জেহেল।

আবু জেহেলের মৃত্যুতে কুরাইশদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গেলো। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালাতে লাগলো তারা। মুসলিম সৈন্যরা তাদের পিছু ধাওয়া করে অনেককে হত্যা করলেন, গ্রেফতারও করলেন অনেককে।

চরম পরাজয় ঘটলো কুরাইশদের। সত্তরজন নিহত ও সত্তরজন বন্দী হলো তাদের। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে শহীদ হলেন চৌদ্দজন।

মক্কা জীবনে চৌদ্দজন কুরাইশ নেতা মহানবীকে (সা.) হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো। নিহতদের মধ্যে তদের এগারজন ছিলো। সেসব হতভাগারা হলো– আবু জেহেল, শাইবা, আকাবাহ, তাইমা, হারিস, নাজর, আবুল বখতারি, জামাহ, বানিয়াহ, মুনাববাহ ও উমাইয়া। বেঁচে যান শুধু আবু সুফিয়ান (এ যুদ্ধে আসেননি), জুবাইব বিন মুতিম ও হাকিম বিন হিজাম। এঁরা তিনজনই পরে ইসলাম কবুল করেন। মর্যাদা পান বিশিষ্ট সাহাবীর।

বদরের যুদ্ধের ফলে মানব ইতিহাসের এক নতুন যুগের সূচনা হলো। সে যুগ স্বর্ণালী আলোয় উদ্ভাসিত। উভ্যুদয় হলো একটি জাতি সত্তার। বিশ্বাস, প্রেরণা, কর্ম ও সাহসের অনির্বাণ আলো ছড়িয়ে পড়লো। আরব মরুর সংকীর্ণ প্রান্তরে উজ্জীবিত হলো ইসলামের বার্তাবাহক ও তাঁর সঙ্গীরা। তাই এ যুদ্ধ ছিলো প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের সাথে অজ্ঞতার, সত্যের সাথে মিথ্যের শক্তি পরীক্ষা। মিথ্যের ওপর সত্যের জয় যে অনিবার্য বদরের যুদ্ধে তাই প্রমাণিত হলো। কুরাইশদের শক্তি, সাহস ও অহঙ্কার খর্ব হলো। বেড়ে গেলো ইসলামের শক্তি ও মর্যাদা।

## পাঁচ

বদরের যুদ্ধ শেষ হয়েছে, তবে তার ফলাফলের খবর মদীনায় তখনো আসেনি। মদীনায় তখন দুটো দল। মুসলিম ও অমুসলিম। অমুসলিমরা দাঁড়িয়েছে একই ছায়ায়, একই দলভুক্ত তারা। ইহুদী, খৃস্টান, মোনাফিক, পৌত্তলিক সবাই মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে। তাদের একান্ত ইচ্ছে বদরে মুসলমানদের পরাজয় হোক, নিশ্চিহ্ন হোক তাদের মিশন, ধ্বংস হোক মুহাম্মদ ও তাঁর প্রিয় সঙ্গীরা– বুকভরা এই আশা নিয়েই তারা যুদ্ধের খবর নেয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

দূরে– যেখানে আদিগন্ত স্পর্শ করেছে মরুর বালুময় মাটি আর নীলাকাশ; সেই দূর সীমানায় অস্পষ্ট দেখা গেলো এক উট চালককে। দৃশ্যটি আরো কাছে এলো, স্পষ্টতর হলো। ইহূদী– পৌত্তলিকরা দেখলো মুহাম্মদের (সা.) উট, নাম যার কাসওয়া; আর সাওয়ার তার যায়েদ বিন হারেস, মুহাম্মদের ঘনিষ্ঠ সহচর। মুহাম্মদের অনুপস্থিতে তাদের মুখে এলো আনন্দের ঝলকানি, আশার এক অনির্বাণ দ্যুতি ঃ মুহাম্মদ আজ পরাজিত। তাঁর সাঙ্গ হয়েছে ইহলীলা।

কিন্তু খানিক পরেই তারা আশাহত হলো। কেননা, যায়েদ উটের পিঠ থেকে নেমেই আনন্দ–অপ্লুত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন সেই মহাবিজয়ের খবর ঃ

“হে মদীনাবাসী, আনন্দ করো, উৎসব করো। উল্লাস-ধ্বনি ছড়িয়ে দাও সর্বত্র। আবু জেহেল, ওতবা, শাইবা সহ অনেক কুরাইশ নেতা নিহত হয়েছে। পরাজয়ের হতাশা আর গ্লানি নিয়েই ফিরেছে তারা। আর মুহাম্মদ (সা.) ফিরে আসছেন বিজয়ী বেশে, তাঁর সহযোদ্ধা সৈন্যদের নিয়ে।”

এই মর্মান্তিক ঘোষণায় হৃদয় দীর্ণ-বিদীর্ণ হলো তাদের। ইহূদী-মোনাফিক-পৌত্তলিকরা মনের দুঃখে যে যার মতো বাড়ি ফিরলো। হতাশার ছায়া নেমে এলো তাদের চোখের সামনে।

আর এদিকে মুসলমানরা আনন্দে আত্মহারা এ সংবাদে। চারিদিক থেকে ছুটে এলো সবাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতার ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো মদীনার আকাশ-বাতাস। এ খুশির দিনটি ছিলো রমযানের আঠার তারিখ।

একুশে রমযান। যুদ্ধবন্দীসহ সসৈন্যে মদীনায় এলেন মহানবী (সা.)। সমবেত সাহাবীরা মোবারকবাদ জানালেন তাঁকে। আনন্দে উদ্বেলিত সবাই। কিন্তু এই আনন্দের মাঝেও নবীজীর মনের কোণে একখণ্ড দুঃখের কালো মেঘ। তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা রোকাইয়া আর ইহজগতে নেই। মদীনার মাটিতে পা দিয়েই তিনি শুনলেন এ শোক সংবাদ। বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত রোকাইয়া (রা.) গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর পীড়ার জন্যে তাঁর স্বামী ওসমান (রা.) যুদ্ধে যেতে পারেননি। মহানবী (সা.) জানতেন তাঁর মেয়ের পীড়া মারাত্মক। তবুও মহান কর্তব্যের খাতিরেই মৃত্যু পথযাত্রী মেয়েকে রেখেই যুদ্ধে গেলেন তিনি। এটাই তো ইসলামের চিরায়ত দাবি, শাশ্বত শক্তি।

ওদিকে কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়ের খবর পৌঁছে গেলো মক্কায়। হাইসমান ইবনে আব্দুল্লাহ আগেই নিয়ে যায় এ দুঃসংবাদ। প্রথমে তার কথা কেউ বিশ্বাসই করলো না। আসলে মানসিকভাবে মোটেই প্রস্তুত ছিলোনা কুরাইশরা। ক্রমে এ শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো মক্কায়। তখন তারা শুরু করলো বিলাপ। এ গ্লানিময় সংবাদ শুনে বর্ষিয়ান কুরাইশ নেতা আবু লাহাব শোকে ও আতঙ্কে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলো এবং সাত দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো সে।

মক্কার ঘরে ঘরে চলতে লাগলো বিলাপ, স্বজন হারানোর রোদন। মুহাম্মদ (সা.) তাদের মহাসর্বনাশ করেছে। নিভিয়ে দিয়েছে বংশের বাতি। পিতাদের করেছে পুত্রহারা, পুত্র-কন্যাদের করেছে এতিম, স্ত্রীদের করেছে বিধবা। এমনি রোদন চললো বেশ কয়েক দিন ধরে। তারপর সংযত হলো তারা। উদ্যোগ নিলো বন্দীদের ফিরিয়ে আনার; আর সেই সাথে বদ্ধপরিকর হলো প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে।

আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করলো ঃ

'মুহাম্মদের ওপর আর একটা হামলা চালিয়ে উপযুক্ত প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত আমি স্ত্রী সঙ্গমজনিত অপবিত্রতা দূর করার জন্য গোসলের পানি মাথায় লাগাবো না।'

এদিকে শাওয়ালের বাকি দিনগুলো এবং পুরো যিলকাদ মাস মদীনায়

থাকলেন মহানবী। যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দিলেন মুক্তিপণের বিনিময়ে। বন্দী মুক্তিদানের ব্যাপারে তিনি যে উদারতার পরিচয় দেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

নবীজী আগেই সাহাবীদের যিম্মায় দিলেন বন্দীদের। সাথে সাথে তাদের সাথে সদয় ব্যবহারেরও আদেশ দিলেন। তাঁর এ আদেশ পালিত হলো অক্ষরে অক্ষরে। সবাই মিলে ভাগ করে নিলেন বন্দীদের। সেবা-যত্ন করতে লাগলেন অকৃপণভাবে। যারা বস্ত্রহীন ছিলো, তাদেরকে বস্ত্র দেয়া হলো। মুসলমানরা নিজেদের সমান খাদ্য দিলেন তাদের। অনেক সাহাবী নিজেদের রুটি বন্দী সৈন্যদের দিয়ে নিজেরা সামান্য খোরমা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন। এরপর মুক্তিপণ দিয়ে ছেড়ে দেয়া হলো তাদের।

বন্দীদের সাধ্যানুসারে মুক্তিপণ নির্ধারণ করলেন মহানবী (সা.)। যারা সঙ্গতি সম্পন্ন, অর্থশালী তাদের প্রত্যেককে দু'হাজার থেকে ছ'হাজার দিরহাম; আর যারা আর্থিকভাবে দুর্বল তাদের জন্যে মাত্র চারশ' দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হলো। যারা মুক্তিপণ দিতে একেবারেই অক্ষম ছিলো, তাদের বিনা পণেই মুক্তি দিলেন। রাসূলের (সা.) চাচা আব্বাসও ছিলেন যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে একজন। তিনি তাকেও বিনাপণে মুক্তি দিলেন না।

রাসূলের এই উদারতা ও ন্যায়-বিচারে মুগ্ধ হলো শত্রু সৈন্যরা। মক্কায় ফিরে গিয়ে তারা প্রচুর প্রশংসা করলো মহানবীর। এমনকি মুগ্ধ হয়ে অনেকে ইসলামও গ্রহণ করলো।

আবু সুফিয়ানের যে কথা সেই কাজ। আর একটি আঘাত হানতেই হবে মদীনার ওপর। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তার। দু'শ' ঘোড় সওয়ার সৈন্য নিয়ে রওনা হলো সে। নাজদিয়া অতিক্রম করে মদীনার অনতিদূরে 'সায়েব' নামক পাহাড়ের কাছে এলো। এখানে একটি ঝর্ণা ছিলো। তারই পাশে তাঁবু খাটালো সে। তারপর সৈন্যদের সেখানে রেখে গেলো সালাম ইবনে মিশকামের কাছে। বনু নাযীর গোত্রের সর্দার সে। অনেক শলা-পরামর্শ হলো তার সাথে। তারপর আবু সুফিয়ান ফিরে এলো সহচরদের কাছে। রাত থাকতেই। তারা মদীনার পার্শ্ববর্তী উরাইয নামক স্থানে উপনীত হলো। আগুন লাগিয়ে দিলো সেখানকার খেজুর বাগানে। সেখানে তারা

দু'জন আনসারকে একটি কৃষি খামারে পেয়ে হত্যা করলো। তারপর আবার ফিরে চললো মক্কার পথে।

আবু সুফিয়ানের এ কুকর্মের সংবাদ পৌছালো রাসূলের (সা.) কাছে। তিনি বেরুলেন তাদের সন্ধানে। 'কারকারাতুল কাদর' পর্যন্ত গেলেন। তবু আবু সুফিয়ান ও তার দল-বলের কোনো হদিস পেলেন না। পেলেন শুধু তাদের ফেলে যাওয়া কিছু জিনিসপত্র। তারা পালাতে চেয়েছিলো দ্রুত। তাই বোঝা হালকা করার জন্যেই ওগুলো ফেলে যায় তারা। এভাবে আবু সুফিয়ান পালন করলো তার প্রতিজ্ঞা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ফিরে এলেন। পুরো যিলহাজ্জ মাস মদীনাতেই কাটালেন। তারপর নাজদের গাতফান গোত্রের বিরুদ্ধে করলেন এক অভিযান। সারা সফর মাস তিনি নাজদেই কাটালেন। তারপর ফিরে এলেন। পুরো রবিউল আউয়াল মাস কাটলো তাঁর মদীনাতেই। এরপর তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে আরো একটি অভিযান পরিচালনা করলেন। তিনি হিজায অতিক্রম করে ফুরু অঞ্চলে গেলেন। সেখান থেকে পৌছালেন বাহরান। সেখানে রবিউল সানী ও জমাদিউল উলা অতিবাহিত করলেন। তারপর নিরাপদে ফিরে এলেন মদীনায়।

এবার নবীজী নজর দিলেন মদীনার ইহূদীদের দিকে। প্রধানত তিনটি গোত্রে বিভক্ত তারা– বনু কাইনুকা, বনু নাযির ও বনু কুরাইজা। মদীনা সনদের আওতায় মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিক ছিলো তারা। বসবাস করছিলো নির্বিবাদে। কিন্তু মনে মনে তারা ছিলো ইসলামের ঘোর বিরোধী। ষড়যন্ত্র শুরু করে প্রথম থেকেই। তাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী তারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করেনি, বরং তাদের মনোভাব ছিলো কুরাইশদেরই অনুকূলে। যুদ্ধের পর লিপ্ত হলো প্রকাশ্য বিরোধিতায়। ওদেরই কবি কা'ব বিন আশরাফ কয়েকজন অনুসারীকে নিয়ে গেলো মক্কায়। স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে উত্তেজিত করে তুললো কুরাইশদের। তাদের সাথে চুক্তি থাকার কারণেই মহানবী (সা.) তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারেননি। কিন্তু এবার তারা প্রাকশ্যে চুক্তি লঙ্ঘন করলো। যুদ্ধ ঘোষণা করলো বনু কাইনুকা গোত্র। বনু কায়নুকার যুদ্ধের ঘটনাটি এমনি ঃ

বাজারে একদিন এক ইহূদী কোনো এক মুসলিম মহিলার শ্লীলতাহানি

করলো। এতে ক্রুদ্ধ হলো এক মুসলিম নও-জোয়ান। সে প্রতিশোধ নিলো চরমভাবে। হত্যা করলো তাকে। বনু কাইনুকার ইহূদীরা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক তরফাভাবে চুক্তি বাতিল করলো। যুদ্ধ ঘোষণা করে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দুর্গে অবস্থান নিলো।

মুসলিমরা দুর্গ অবরোধ করলো। এই অবরোধ স্থায়ী হলো পনেরো দিন। ইহূদীরা বুঝতে পারলো, মুসলিম বাহিনীর সাথে পেরে ওঠা অসম্ভব, সাধ্যাতীত। তারা মদীনা ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি চাইলো। আল্লাহর রাসূল (সা.) অনুমতি দিলেন। তখন দুর্গ থেকে বেরিয়ে চললো তারা। সিরিয়ার দিকে। সময়টা ছিলো হিজরী দ্বিতীয় শতকের শাওয়াল মাস।

## ছয়

যা চাওয়া যায় তার সবটাই পাওয়া যায় না। আবার এমনও হয়; প্রত্যাশা কিছুই মেলে না, বরং হয় উল্টো। বদরের যুদ্ধের ফলাফল হলো তাই। পরাজয় এবং চরম পরাজয়।.....

কুরাইশ পক্ষে নিহত হলো সত্তরজন যোদ্ধা। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলো নেতৃস্থানীয়, যুদ্ধে, বীরত্বে অসামান্য, অনন্য। বন্দীও হয় সত্তরজন, মুক্তিপণ দিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনা হয় তাদের। এই পরাজয়ের গ্লানি তিলে তিলে দগ্ধ করে তাদের, প্রতিশোধের তীব্র জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠে তারা ঃ 'আবার আক্রমণ করতে হবে মদীনা, নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের, সব উদ্যোগ, ইসলাম প্রতিষ্ঠার সব অশুভ আয়োজন।' আর দেরী নয়, এক মুহূর্তও তর সইতে চায় না তাদের।

আবু লাহাব আর নেই। অশুভ মৃত্যুর মধ্যদিয়ে পরপারে তার অনন্ত যাত্রা হয়েছে। এই শূন্যতার ধারায় আগেই যোগ হয়েছিলো আবু জেহেল, ওতবা, শাইবাদের নাম। তাই বলে নেতৃত্ব দেবার কেউ নেই এই কুরাইশ জনপদে, এমন ভাবাই অবান্তর। নেতৃত্ব দিতে কেউ এগিয়ে আসবে, জগৎ– সংসারের এইতো অমোঘ নিয়ম। সেদিনকার নেতৃত্বের উচ্চ সোপানে উঠে এলো আবু সুফিয়ান। বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, ধীর, শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ভেবে-চিন্তে সাত-পাঁচ বুঝেই তার কাজ করার অভ্যাস।

তার কাছে ছুটে এলো ইকরামা। আবু জেহেল তনয়। বুকে তার শোকের জ্বালা, প্রতিশোধের অমলিন স্পৃহা। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার কথা ভেবেই সে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এলো আবু সুফিয়ানের বাড়ির দরজায়। আনত মুখে সে আর্জি করলো ঃ

'চাচাজান'।

'বলো, কী বলতে চাও? বলো!?'

'মুহাম্মদ (সা.) আমাদের বংশের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে। এর প্রতিশোধ নিতে চাই। এজন্যে আমার ব্যবসায়ের লাভের অংশ ব্যয় করতে ইচ্ছা করি।'

ইকরামার এই লোভনীয় প্রস্তাব লুফে নিলো আবু সুফিয়ান। সে যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হলো। এক কথায় সায় দিলো তার প্রস্তাবে। কুরাইশ দলপতিদের সাথে পরামর্শ করে সে যুদ্ধের আয়োজন করলো। আবারও রণ সাজে মেতে উঠলো কুরাইশরা। যুদ্ধ জয়ের নেশায় তারা সংঘবদ্ধ হলো, নানা আয়োজনে মুখরিত হলো চারিদিক।

প্রস্তুত হলো তিন হাজার সৈন্যের সম্মিলিত যোদ্ধা। তার মধ্যে সাতশ' বর্মধারী, দু'শ' অশ্বারোহী, অবশিষ্টরা উষ্ট্রারোহী ও পদাতিক সৈন্য।

চলেছে কুরাইশ বাহিনী। মদীনা অভিমুখে। অপূর্ব সে রণ সজ্জা। সামনে উড়ছে জয় নিশান। পেছনে দেবতা 'হোবল' ঠাকুরের মূর্তি। তার পেছনে লাবণ্যময়ী রমণীর দল। কণ্ঠে তাদের রণ-সঙ্গিত। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাই এ রমণী দলের নেত্রী। সেনাপতি আবু সুফিয়ান। ইকরামা ইবনে আবু জেহেল ও খালিদ ইবনে ওয়ালীদ তার সহ সিপাহসালার।

মহানবীর (সা.) চাচা হযরত আব্বাস (রা.) তখনো মক্কায়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের বিপুল রণ প্রস্তুতি দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন তিনি। পত্র দিয়ে খবর পাঠালেন মদীনায়।

হযরত আব্বাসের দেয়া পত্র যথা সময়ে হস্তগত হলো মহানবীর (সা.)। তিনি দু'জন সাহাবাকে পাঠালেন কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্যে। তারা ফিরে এসে জানালেন ঃ

'কুরাইশ বাহিনী মদীনার অতি নিকটবর্তী। 'জুল হুলায়ফা'য় শিবির স্থাপন করেছে তারা। তাদের পশুগুলো মদীনার চারণভূমির ঘাস নিংশেষ করে ফেলেছে।'

তৃতীয় হিজরী। শাওয়ালের চৌদ্দ তারিখ। শুক্রবার। জু'মা বাদ সাহাবাদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসলেন নবী (সা.)। মদীনার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও ডাকা হলো। হাজির হলো মোনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও।

হযরতের নিজের মত ছিলো মদীনা থেকেই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, শত্রুর মুখোমুখি হওয়া। যাতে মদীনার সবাই অংশ নিতে পারে, স্বাচ্ছন্দে, সহজে। তিনি বলে উঠলেন, "এবার আমরা নগর ছেড়ে যুদ্ধে যাবো না; এতে অনেক বিপদ হতে পারে।" বেশির ভাগ মুহাজির ও আনসাররা সমর্থন করলেন এ মত। সায় দিলো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও। কিন্তু তরুণ সাহাবারা বিরোধিতা করলেন একথার। যাঁরা বদরের যুদ্ধে শহীদ হতে পারেননি অথবা যাঁরা যুদ্ধে যোগ দিতেও পারেনি; তাঁরাই জেদ ধরলেন ঃ 'শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুর ওপর আক্রমণ চালাবো আমরা।' মহানবীর (সা.) চাচা বীর হামযাও (রা.) যোগ দিলেন যুবক দলে। তিনি বললেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ, যিনি আপনার ওপর কুরআন নাযিল করেছেন, সেই সত্তার শপথ– মদীনার বাইরে গিয়ে ওদের সাথে যুদ্ধ না করতে পারলে আমি পানাহার ছেড়ে দেবো।"

নবীজী (সা.) ঘরে চলে গেলেন। খানিক পরে বেরিয়ে এলেন। পরিধানে তাঁর লৌহবর্ম। সেনাপতির বেশ। তা দেখে তরুণেরা ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন ঃ 'আমরা হযরত (সা.) কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বের হতে বাধ্য করছি।' তাঁরা সবিনয়ে আরজ করলেন ঃ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আমাদের মত প্রত্যাহার করে নিলাম।

'একবার যুদ্ধ সাজ পরিধান করে তা খুলে ফেলা পয়গম্বরের জন্য শোভনীয় নয়।' বললেন রাসূল (সা.)।

বের হলেন নবী। মাত্র এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে। এর মধ্যে

মাত্র দু'জন অশ্বারোহী, সত্তরজন বর্মধারী, পঞ্চাশ জন তীরন্দাজ। বাকীরা পদাতিক সৈন্য। তাদের কারো হাতে বর্শা, কারো হাতে ঢাল-তলোয়ার।

পথিমধ্যে এ থেকেও কমে গেলো তিনশ'। সৈন্য বাহিনী যখন 'শাওত' নামক স্থানে পৌছালো, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার অনুগত তিনশ' সৈন্য নিয়ে সরে পড়লো। এতে মন ভেঙ্গে গেলো মুসলিমদের। হতাশা ও অস্থিরতা দেখা দিলো দলের মধ্যে। ফিরে যেতে চাইলো বনু সালামা ও বনু হারেসার লোকেরাও। কিন্তু প্রধান প্রধান সাহাবাদের প্রচেষ্টায় তা রোধ করা সম্ভব হলো। ফলে অবশিষ্ট থাকলো মাত্র সাতশ' সৈন্য। মহানবী (সা.) তাই নিয়েই এগিয়ে চললেন সামনে।

পরের দিন। শাওয়ালের পনেরো তারিখ। শনিবার। মদীনা হতে চার মাইল দূরে ওহূদ পাহাড়ের পাদদেশে পৌছালেন মহানবী (সা.)। সেখানেই সৈন্য সাজালেন তিনি। পাহাড় পড়লো পেছনে। পাহাড়ের এক পাশে একটি গিরিপথ। এখান থেকে আকস্মিক আক্রমণের আশঙ্কা ছিলো। এখানে দাঁড়িয়ে দিলেন পঞ্চাশ জন তীরন্দাজ সৈন্য। নেতা তাদের আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর। মহানবী (সা) তীরন্দাজ বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন ঃ

"কাউকে আমাদের কাছে আসতে দেবে না এবং কোনো অবস্থায়ই এই স্থান ত্যাগ করবে না। তোমরা যদি দেখো, পাখিরা আমাদের গোশত ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে, তবুও এই স্থান হতে হটবে না।"

শত্রুরা তিন দিন আগেই এসেছিলো ওহূদে। তারা ছিলো পাহাড়ের সামনের দিকে। ডানদিকে- খালিদ বিন ওয়ালীদ, বামদিকে- ইকরামা বিন আবু জেহেল, মাঝখানে- আবু সুফিয়ানের সাথে আব্দুল ওজ্জা। সৈনিকদের সামনে থেকে পেছনের দিক পর্যন্ত যাওয়া- আসার একটি পথ রাখা হয়েছে। এই পথ দিয়েই কুরাইশ সুন্দরীরা যাবে-আসবে। রণ-সঙ্গিত গাইবে। উত্তেজিত করবে সৈনিকদের।

উভয় দিকে উভয় সৈন্যদল প্রস্তুত। কুরাইশ সৈন্যরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে হুঙ্কার দিচ্ছে। অন্যদিকে মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্যে বিজয় ও জান্নাত লাভের জন্যে আকুল প্রার্থনা করছেন।

শুরু হলো যুদ্ধ। প্রথমেই কুরাইশ পক্ষের বিখ্যাত বীর তালহা দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানালো। তার আহ্বানে সাড়া দিলেন হযরত আলী (রা.)। মুহূর্তের মধ্যেই জাহান্নামে পাঠালেন তাকে। তালহার এই পরিণতি দেখে তার ছেলে সামান ছুটে এলো। তার মোকাবিলা করলেন- হযরত হামযা (রা.)। তীব্র বেগে আঘাত করলেন তাকে। দু'খণ্ড হয়ে গেলো তার দেহ। এই দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলো কুরাইশরা। তারা আর দ্বন্দ্ব যুদ্ধে সাহস না পেয়ে একযোগে আক্রমণ করলো মুসলমানদের।

মুসলমানরাও সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাফিরদের ওপর। ভীষণ যুদ্ধ চলতে লাগলো। ক্রমেই তা ভীষণ হতে ভীষণতর হলো। মুসলমানদের হাতে নিহত হতে লাগলো অনেক কুরাইশ বীর। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা ও অন্যান্য কুরাইশ নারীরা দামামা বাজিয়ে আর গান গেয়ে উৎসাহিত করছিলো কুরাইশদের। কিন্তু তাতে কোনো ফলই হলো না। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণে কাফিররা একের পর এক ধরাশায়ী হতে লাগলো। অনেকেই প্রাণ ভয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করলো। আশ্রয় নিলো নিকটবর্তী পাহাড় ও জঙ্গলে গিয়ে।

এরপর কেটে গেলো আরো কিছুক্ষণ। তখন ময়দানে আর একজনও কুরাইশ সৈন্য নেই। মুসলিমরা মনে করলো, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এখন মালে গণিমত সংগ্রহ করার সময়। এই ভেবে তারা শত্রু সৈন্যের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে লেগে গেলো। তাদের সাথে যোগ দিলো পাহাড়ী পথের তীরন্দাজ সৈন্যরাও। স্থান ত্যাগ করে গণিমতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তারাও। তাদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) নিষেধ করলেন, কিন্তু তারা কর্ণপাত করলো না তাতে।

এ সময় কাফের সৈন্যদের কমান্ডার খালিদ ইবনে ওয়ালীদ পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিলো। পাহাড়ের পেছন থেকে সংকীর্ণ পথ দিয়ে এসে আক্রমণ করলো মুসলিমদের। বড়ই ভয়ঙ্কর সে আক্রমণ। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর স্বল্প সংখ্যক সাথী নিয়ে প্রতিরোধ করতে চাইলেন; কিন্তু পারলেন না। শত্রু সৈন্যের সহসা সয়লাব গ্রাস করে ফেললো মুসলমানদের। যেসব কাফের সৈন্যরা পালিয়ে ছিলো, তারাও এই সুযোগে ফিরে এলো, আক্রমণ করলো,

একযোগে। এক আকস্মিক ও অভাবিত আক্রমণে মুসলমানরা এতদূর হতাশ ও দিশেহারা হলো যে, তাদের একটি বিরাট অংশ পলায়নে তৎপর হলো। কেবল কয়েকজন বাহাদুর সৈন্য ময়দানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে নিজেদের অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছিল।

মুহূর্তের মধ্যে কাফেরদের আক্রমণ তীব্রতর হলো। শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন হযরত হামযা (রা.) সহ অনেক বীর মুসলিম। মুসলমানদের পতাকা ছিলো হযরত মোসআব (রা.) এর হাতে। যাঁর চেহারা অনেকটা মহানবীর (সা.) মতোই। হঠাৎ শত্রুপক্ষের একটা তীর এসে লাগলো তাঁর বুকে। শহীদ হলেন তিনি। এ সময় ইবনে কামিয়া নামের এক কাফির সৈন্য প্রচার করলো, 'মুহাম্মদ (সা.) নিহত হয়েছে।'

এ দুঃসংবাদে সাহাবাদের শক্তি ও সাহস সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হলো। অনেকেই হতাশ হয়ে একেবারে বসে পড়লেন। তখন নবী করীম (সা.) এর চারপাশে মাত্র দশ বারো জন নিবেদিত প্রাণ সাহাবী ছাড়া আর কেউ ছিলো না। ঠিক এমনি সময় সাহাবারা জানতে পারলেন, নবী করীম (সা.) জীবিত আছেন। তখন চারিদিক থেকে সাহাবারা এসে সমবেত হলেন তাঁর পাশে।

কাফিরদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো মহানবীকে (সা.) হত্যা করা। তারা যখন দেখলো, তিনি নিহত হননি, তখন তারা একসাথে তাঁর দিকেই ধাবিত হলো। ইবনে কামিয়া দ্রুত নবীজীর কাছে এলো। সজোরে আঘাত করলো তাঁর শিরস্ত্রাণে। ভেঙ্গে গেলো শিরস্ত্রাণ এবং এর কিছু অংশ বিদ্ধ হলো তাঁর গণ্ডদেশে। এ সময় আরেক দুরাত্মা তাঁর মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করলো। সেই পাথরের আঘাতে দাঁত ভেঙ্গে গেলো নবীর (সা.), রক্তাক্ত হলো পবিত্র বদন। বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন তিনি। হুঁশ পেলেন খানিক পরে।

ইতোমধ্যে সুদক্ষ সাহাবীদের আক্রমণে কুরাইশদের আক্রমণের তীব্রতা কম হয়ে এলো। আবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করলো তারা। তখন কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী নবীকে (সা.) নিয়ে গেলেন পাহাড়ের ওপর নিরাপদ স্থানে।

এ সময় কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান পাহাড়ের পাদদেশে এলো। সে চিৎকার করে বললো ঃ

"এখানে মুহাম্মদ আছে? আবু বকর আছে? ওমর আছে?"

মহানবীর (সা.) নির্দেশে কেউ কোনো জবাব দিলেন না। আবু সুফিয়ান তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো ঃ

"তাহলে সবাই ধ্বংস হয়েছে।"

হযরত ওমর (রা.) আর চুপ থাকতে পারলেন না। তিনিও চিৎকার করে বললেন ঃ

"ওরে হতভাগা! তুই কি বলছিস? তোকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে জীবিত রেখেছেন।"

"আচ্ছা থাকো। আগামী বছর বদর প্রান্তরে আবার তোমাদের সাথে বুঝাপড়া হবে।"

"বেশ তাই হবে। আমরা এর জন্যে প্রস্তুত থাকবো, ইনশাল্লাহ।"

আবু সুফিয়ান আর কোনো জবাব দিলো না। সসৈন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো মক্কার পথে।

'রওয়া' নামক স্থানে গিয়ে থামলো সে। সদলবলে সেখানে কিছুক্ষণ থাকার আয়োজন করলো। দারুণ হতাশা নেমে এলো তার সৈন্যদের মনে। সবার মুখে একটাই প্রশ্ন ঃ "কি জন্যে এসে ছিলাম? ফিরেই বা যাচ্ছি কেন? এসেছিলাম মুসলমানদের ধ্বংস করতে। কিন্তু তা পারলাম কই? যুদ্ধে যখন জয়-পরাজয় নিশ্চিত হলো না, তখন ফের আক্রমণ করলাম না কেন? চলো আবার যাই।"

কেউ কেউ বললো এর বিপরীত ঃ "এখন মদীনা আক্রমণ করতে গেলে বিপদ হবে। মদীনার সংকীর্ণ গলিতে একবার প্রবেশ করলে আর ফিরে আসা যাবে না। তাই ফিরে যাওয়া ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই।"

আসলে আল্লাহ্ পাক তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআনের ঘোষণায় তা পরিষ্কার বোঝা যায় ঃ "আমি এখনই কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিচ্ছি।" (সূরা আল-ইমরান ঃ ১৫১)

এদিকে আহত নবী (সা.) সাহাবাদের সাহায্যে নেমে এলেন পাহাড় থেকে। বের হলেন শহীদদের লাশের সন্ধানে। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে প্রিয় সাহাবাদের লাশ। বেশির ভাগ শহীদের দেহ বিকৃত করেছে বিধর্মীরা। সবচে' বিকৃত অবস্থায় দেখা গেলো একটি লাশ। সে লাশের পেট চেরা, কান ও নাক কাটা। কার লাশ? হামযার। হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। কে করলো এমন নিষ্ঠুর কর্ম? হিন্দা। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী ও ওতবার কন্যা হিন্দা। বদরের যুদ্ধে তার পিতা- হত্যাকারী হামযার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলো সে। তাই হযরত হামযার (রা.) লাশ বিকৃত করলো হিন্দা। সে তাঁর নাক-কান কাটলো, পেট চিরে ফেললো। তারপর কলিজা বের করে চিবালো, কিন্তু গিলতে না পেরে ফেলে দিলো।

চাচা হযরত হামযার এই করুণ অবস্থা দেখে মহানবী (সা.) ভীষণ মর্মাহত হলেন। নিদারুণ ব্যথায় ব্যথাতুর হয়ে উঠলো তাঁর কোমল হৃদয়।

মোট শহীদ হয়েছেন সত্তর জন। তাঁদের বেশির ভাগই আনসার। নবীজী শহীদদের দাফনের কাজ শেষ করলেন। তারপর ফিরে এলেন মদীনায়।

তখন সন্ধ্যা সমাগত। শোকের ছায়া নেমে এসেছে মদীনায়। কান্নার রোল পড়েছে ঘরে ঘরে। সবাই শোক প্রকাশ করছে প্রিয়জনদের জন্যে। এ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন নবী। ক্ষণিকের জন্যে তাঁর মনে হলো, সবাই স্বজনদের জন্যে রোদন করছে, কিন্তু হামযার শোকে রোদন করার কেউ নেই।

## সাত

ওহূদের যুদ্ধে মুসলমানরা পুরোপুরি পরাজিত হয়নি, কিন্তু তাদের ক্ষতি হয়েছে অনেক। সত্তরজন সাহাবীর প্রাণ প্রদীপ নিভে গেছে, আহত হয়েছেন প্রায় সবাই। নবীজী নিজেও অক্ষত ছিলেন না। শত্রু পক্ষের তীর আর পাথরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়েছে তাঁর কুসুম কোমল দেহ। এসবের মূলেই ছিলো কয়েকজন মুসলমানের একটিই ভুল। আর তা হলো রণ কুশলী নবীর (সা.) আদেশ অমান্য করা। যা করেছিলো পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়ানো তীরন্দাজ সেনারা। তবু এই বিরাট বিপর্যয়ের মধ্যে

কল্যাণও ছিলো, ছিলো মুসলমানদের জন্যে এক মহতি শিক্ষা ঃ নেতার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। যুদ্ধ শেষে সবার মনে এই শিক্ষাই গেঁথে গেলো যে, তারা নেতার আদেশ আর অমান্য করবে না।

প্রায় দু'মাস হলো যুদ্ধ শেষ হয়েছে। হারানোর ব্যথা–বেদনাও সবাই ভুলতে বসেছে। আহত আনসার–মুহাজিররা (রা.) প্রায় সবাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। রাসূল (সা.) রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সাথে ইসলাম প্রচারের কাজে মগ্ন হয়েছেন। সমস্ত মদীনা জুড়ে বইছে শান্তির সুবাতাস।

কিন্তু এই অনুকূল হাওয়াকে উল্টো দিকে ঘুরাতে চাইলো অবিশ্বাসীরা। আরবের প্রায় প্রতিটি অবিশ্বাসী গোত্রই মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি সাধনে তৎপর হলো তারা।

হিজরী চতুর্থ সন। মহররম মাস। মরুভূমির মাঝখানের বনি আসাদ গোত্রের লোকেরা মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিলো। দুর্ধর্ষ লুটেরা তারা। এ সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) মোটেই সময় নষ্ট করলেন না। হযরত আবু সালমার (রা.) নেতৃত্বে একশ' পঞ্চাশ জন মুহাজির ও আনসারকে পাঠালেন তাদের বিরুদ্ধে। ভীত হয়ে পড়লো তারা। পরিত্যাগ করলো তাদের প্রস্তুতি।

মহররম মাস তখনো শেষ হয়নি। পার্বত্য অঞ্চলের লেহয়ান গোত্রের সুফিয়ান ইবনে খালেদ তৈরি হলো তার দলবল নিয়ে। সে-ও মদীনা আক্রমণ করতে চায়। তাকে বাধা দেয়ার জন্যে রাসূল (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) কে পাঠালেন। তিনি কৌশলে হত্যা করলেন সুফিয়ানকে।

এরপর 'আজাল' ও 'কারাহ' গোত্র থেকে একদল লোক এলো মদীনায়। চরম মিথ্যার আশ্রয় নিলো তারা। মহানবীকে (সা.) বললো ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের গোত্রের লোকেরা ইসলাম কবুল করেছে। তাই আপনার সহচরদের মধ্য থেকে একটি দলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা ইসলামের বিধি-বিধান শিখতে পারি।"

আল-আমীন নবী (সা.) তাদের কথা বিশ্বাস করলেন। দশজন সাহাবীর একটি দলকে পাঠালেন তাদের সাথে। এই দলের নেতা নিযুক্ত হলেন মুরসাদ ইবনে আবু মুরসাদ (রা.)।

সাহাবীদের এই দলটি যখন মক্কা ও আসফানের মধ্যবর্তী 'রাযী' নামক স্থানে পৌঁছালেন, তখনই প্রতারকরা তাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলো। সেখানকার হুযাইল গোত্রকে লেলিয়ে দিলো তাদের বিরুদ্ধে। তৈরি হয়ে এলো হুযাইল গোত্রের লোকেরা। দু'শ' তরবারি ধারী ঘাতক ঘিরে ফেললো সাহাবাদের। সাহাবারাও নিজ নিজ তরবারি নিয়ে তৈরি হয়ে গেলেন।

লড়াই শুরু হলো। কিন্তু এই অসম যুদ্ধে পেরে উঠলেন না মুসলমানরা। দশজনের সাতজনই শহীদ হলেন। বন্দী হলেন তিনজন– আসেম, খোবাইব ও যায়েদ (রা.)।

অবিশ্বাসীরা তাদের নিয়ে চললো। মক্কায়। কুরাইশদের কাছে বিক্রি করার জন্যে। পথিমধ্যে আসেম (রা.) কৌশলে বন্ধন মুক্ত হলেন। তরবারি ধরলেন কাফিরদের বিরুদ্ধে। বেশ কিছু কাফির প্রাণ হারালো তাঁর হাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শহীদ হলেন তিনি। মৃত্যুর আগে আসেম আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আমার মৃত্যুর খবর তোমার রাসূলকে (সা.) পৌঁছে দিও; আর আমার মৃত দেহকে কাফিরদের অনাচার হতে রক্ষা করো।"

আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হলো আসেমের এই অন্তিম প্রার্থনা। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওহীর মাধ্যমে খবর পেলেন নবী (সা.)। আর তাঁর মৃত দেহও কাফেরদের অত্যাচার হতে রক্ষা পেলো। কাফিররা চেয়েছিলো– তাঁর মাথা কেটে নিয়ে যাবে, মক্কায়। বিনিময়ে অনেক পুরস্কার নেবে কুরাইশদের কাছ থেকে। কিন্তু তা পারলো না তারা। একঝাক মৌমাছি এসে পাহারা দিতে লাগলো তাঁর লাশ। ফলে কাফিররা কাছে আসতে পারলো না কিছুতেই। তারা ভাবলো, 'রাত্রে মৌমাছি চলে যাবে। তখন মাথা কেটে নিয়ে যাবো।' এই ভেবে অপেক্ষা করতে লাগলো তারা। কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্যও সফল হলো না। রাতে বন্যা হলো প্রবল বেগে। তাতেই ভেসে গেলো তাঁর পবিত্র লাশ। কোথায় কেউ জানলো না।

বাকি দু'জন সাহাবী– হযরত খোবাইব (রা.) ও হযরত জায়েদ (রা.) বন্দী অবস্থায় আনীত হলেন মক্কায়। দু'জন দীনের দুশমন কিনলো তাঁদের, বধ

করার জন্যে। যাদের পিতারা যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো খোবাইব ও যায়েদের হাতে। তাই তারা তাদের বধ করে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইলো।

তারা খোবাইব ও যায়েদকে নিয়ে গেলো নিজ নিজ বাড়িতে। আটকে রাখলো অন্ধকার ঘরে। চালাতে লাগলো সীমাহীন নির্যাতন। তারপর নির্ধারিত দিনে তাদের নিয়ে গেলো বধ্যভূমিতে।

প্রথমে আনা হলো খোবাইব কে। মক্কার তানয়ীম বধ্যভূমিতে। দাঁড় করানো হলো তাঁকে শূল দণ্ডের পাশে। একটু পরেই হত্যা করা হবে তাঁকে, নির্মমভাবে। ঘাতকরা ঘিরে আছে তাঁর চারপাশ। জীবনের এই শেষ মুহূর্তে খোবাইব দু'রাকাত নামায পড়তে চাইলো। অন্তিম আশা তাঁর। সুযোগ দিলো ঘাতকরা। হযরত খোবাইব সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকাত নামায পড়লেন। তারপর বললেন, "আমার মনে হচ্ছিল, নামায আরো দীর্ঘ করি, কিন্তু তোমরা যদি মনে করো, মৃত্যুর ভয়ে আমি দেরী করছি; তাই সংক্ষিপ্ত করলাম।"

তারপর কাফিররা খোবাইব (রা.) কে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করলো, নিষ্ঠুরভাবে। শহীদের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হলো বালুময় তানয়ীম বধ্যভূমি।

এরপর কুরাইশ নেতারা যায়েদকেও নিয়ে এলো বধ্যভূমিতে। দল বেঁধে এলো অবিশ্বাসীরা, তামশা দেখতে। ঘাতক যখন তরবারি তুলে নিলো, তখন আবু সুফিয়ান বললো ঃ

'যায়েদ, সত্যি করে বলো তো, এই ফাঁসি কাষ্ঠে যদি মুহাম্মদ (সা.) কে ঝুলিয়ে দেয়া হয় আর তার বিনিময়ে তুমি মুক্তি লাভ কর, তবে কি তুমি খুশি হবে?'

'সাবধান কাফির! মুখ সামলে কথা বলো। আমার মুক্তির বিনিময়ে আমার প্রিয়তম নবীর (সা.) গায়ে একটি কাঁটা ফুটুক তাও আমি চাই না।'

আবু সুফিয়ানের প্রশ্নের জবাব নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন যায়েদ (রা.)। চোখে মুখে তাঁর ভয়ের কোনো চিহ্ন নেই। তখন ঘাতকরা তরবারি হাতে এগিয়ে এলো। নির্মমভাবে আঘাত করতে লাগলো, বারবার। আল্লাহুর নাম নিয়ে হাসিমুখে শহীদ হলেন হযরত যায়েদ (রা.)।

এই মাসেই ঘটে গেলো আরেক সহিংস ঘটনা। নির্মমভাবে শহীদ হলেন আরো সত্তরজন সাহাবী। অত্যন্ত হৃদয় বিদারক সে ঘটনাটি এমনি ঃ

নজদের বনি আমির গোত্রের আবু বারা আমির ইবনে মালিক নামক এক লোক এলো মদীনায়। মহানবী (সা.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে গ্রহণও করলো না, আবার ইসলামের বিরুদ্ধেও কিছু বললো না। শুধু বললো ঃ 'হে মুহাম্মদ, আপনি যদি আপনার কিছু সংখ্যক সাহাবীকে নজদবাসীর কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তারা যদি তাদেরকে আপনার দ্বীনের দাওয়াত দেন, আমার মনে হয়, তারা আপনার দ্বীন গ্রহণ করবে।' 'নজদবাসীরা তাদের ক্ষতি করতে পারে বলে আমার আশঙ্কা হয়।' বললেন নবীজী।

'আমি তাদের নিরাপত্তার যিম্মাদার। আপনি তাদের পাঠিয়ে দিন।'

সরল প্রাণ নবী (সা.) বারার কথা বিশ্বাস করলেন। সত্তরজন বিশিষ্ট সাহাবীকে পাঠালেন তার সাথে। সেই সাথে বনি আমির গোত্রপতি তুফাইলের কাছে পাঠালেন একখানা পত্র।

সাহাবারা বীরে মাউনায় গিয়ে থামলেন। সেখান থেকে হারাম ইবনে মিলহানকে (রা.) পাঠালেন তুফাইলের কাছে। রাসূলের (সা.) পত্র দিয়ে।

পত্র নিয়ে পৌঁছে গেলেন হারাম ইবনে মিলহান (রা.)। তাঁকে দেখে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো তুফাইল। সে রাসূলের (সা.) পত্রের দিকে না তাকিয়েই হত্যা করলো হারামকে। তারপর তার দলবল নিয়ে বীরে মাউনায় উপস্থিত হলো। অতর্কিতে আক্রমণ করলো ইসলাম প্রচারকদের। ফলে একমাত্র আমর ইবনে উমাইয়া (রা.) ছাড়া সবাই শহীদ হলেন।

আমর ইবনে উমাইয়া ফিরে আসছিলেন মদীনায়। পথিমধ্যে তাঁর সাথে দেখা হলো বনি আমির গোত্রের দু'জন লোকের। যারা মদীনায় মহানবীর (সা.) কাছে একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হযে দেশে ফিরছিলো। কিন্তু আমর ইবনে উমাইয়া (রা.) সে খবর জানতেন না। তিনি লোক দু'টোকে শত্রু বলেই মনে করলেন। তাই তাদেরকে গাছের ছায়ায় ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করলেন তিনি।

তারপর তিনি ফিরে এলেন মদীনায়। নবীজীকে জানালেন সব কথা। সত্তরজন বিদ্বান সাহাবার মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত হলেন নবী (সা.)। অন্যদিকে বনি আমির গোত্রের দু'জন নিরীহ লোককে হত্যার জন্যেও তিনি দুঃখিত হলেন। তিনি তাদের রক্তপণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

নিহত দুই ব্যক্তির রক্তপণ দেয়ার জন্যে মহানবী (সা.) গেলেন বনি নাযির গোত্রের কাছে। কেননা ইতোপূর্বে এই গোত্রের সাথে চুক্তি হয়েছিলো তাঁর। চুক্তির শর্তানুযায়ী নিহত দুই ব্যক্তির রক্তপণের একটা অংশ বনি নাযিরের-ও পরিশোধের কথা।

প্রথমে তারা নবী (সা.) কে স্বাগত জানালো। রক্তপণের নির্ধারিত অংশ দিতেও সম্মত হলো। কিন্তু একটু পরেই তাদের মাথায় এলো এক কুটিল বুদ্ধি। তারা গোপন পরামর্শ করতে লাগলো কিভাবে রাসূলকে হত্যা করা যায়। এ সময় নবীজী একটা দেওয়ালের পাশে বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর, ওমর ও আলী। এ সময় বনি নাযিরের এক নেতা বললো ঃ 'কে আছো যে পাশের ঘরের ছাদে উঠে একটা পাথর মুহাম্মদের ওপর গড়িয়ে দিতে পারবে এবং তার কবল থেকে আমাদেরকে রেহাই দেবে?'

'আমি পারবো'।– বললো আমর ইবনে জাহ্‌াশ ইবনে কা'ব।

উপরে উঠতে লাগলো আমর। তখনই আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে ইহূদীদের এ ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন রাসূল (সা.) কে। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সরে পড়লেন নবী। তাঁর সঙ্গীরা কেউ টেরই পেলেন না। অনেকক্ষণ পরে তাঁরা তাঁকে খুঁজতে বের হলেন। এক পথচারী জানালো ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহকে (সা.) মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছি।'

তখন আশ্বস্ত হলেন সাহাবারা। তাঁরা তাঁর কাছে যাবার জন্যে দ্রুত রওনা হলেন।

ইতোপূর্বে বীরে মাউনার হত্যাকাণ্ডে বনু আমির ও বনু সালেম গোত্রের সাথে বনি নাযিরও জড়িত ছিলো। কিন্তু তাতেও তৃপ্ত হতে পারিনি তারা। শেষ পর্যন্ত নবীকে (সা.) হত্যা করারও চক্রান্ত করলো। তাই নবীজী মদীনায়

এসেই মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন বনি নাযিরের ওপর আক্রমণ করতে।

মুসলমানরা আক্রমণ চালালো তাদের ওপর। দুর্গে আশ্রয় নিলো ইহূদীরা। মুসলমানরা দুর্গ অবরোধ করে রাখলো। বেশ কয়েক দিন কেটে গেলো এভাবে। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইসহ কয়েকজন মোনাফিক সর্দার অভয় বার্তা পাঠালো তাদের কাছে ঃ

"তোমরা ভয় পেয়ো না। আত্মসমর্পণও করো না। আমরা তোমাদের পক্ষে আছি। আমরা তোমাদের রক্ষা করবই। কিছুতেই মুসলমানদের হাতে পরাজিত হতে দেবো না তোমাদের।"

মোনফিকদের কথার সাথে কাজের কোনো মিল নেই। মিল হলো না এ ক্ষেত্রেও। একশ' পঞ্চান্ন দিন কেটে গেলা, তবু তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য এলো না। অবশেষে ইহূদীরা তাদের অনিবার্য পতন দেখতে পেলো। তারা মহানবীর (সা.) কাছে অনুরোধ করলো ঃ

'আমাদের প্রাণে মারবেন না। আমাদেরকে বহিষ্কার করুন, আমরা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সব রেখে যাবো।'

মহানবী (সা.) তাদের এ অনুরোধ রক্ষা করলেন। মদীনা থেকে বহিষ্কার করলেন তাদের। তারা তাদের উটের পিঠে বহনযোগ্য অস্থাবর ধন-সম্পদ নিয়ে চলে গেলো। কিছু খায়বারে, কিছু সিরিয়ায়।

এদিকে আবু সুফিয়ানের চ্যালেঞ্জের সময় ঘনিয়ে এলো। মহানবী (সা.)ও তার জবাব দিতে তৈরি হলেন। শাবান মাসে আবার বেরুলেন তিনি দ্বিতীয় বদর অভিযানে। শিবির স্থাপন করলেন সেখানে গিয়ে। অপেক্ষা করতে লাগলেন আবু সুফিয়ানের জন্যে।

ওদিকে আবু সুফিয়ানও দু'হাজার সৈন্য নিয়ে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। তবে যুদ্ধ করার জন্যে নয়; মুসলমানদের ভয় দেখাতে আর নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে। মক্কা থেকে আট মাইল দূরে এসে সে শুনতে পেলো মুসলমানদের আগমনের কথা। দারুণ ভীতির সঞ্চার হলো তার মনে। তাই সামনে আর এগুতে চাইলো না সে, ফিরে যেতে চাইলো দলবল নিয়ে। সৈন্যদের বললো ঃ

'হে কুরাইশরা, তোমাদের জন্য যুদ্ধ করা কেবল ভালো ফসল ফলার বছরই শোভা পায়। কিন্তু এটা তো অজন্মার বছর। তাই আমি ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরাও ফিরে চলো।'

এদিকে মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলেন। এক এক করে আট দিন কেটে গেলো। তবু আবু সুফিয়ানের বাহিনী এলো না। তখন তিনি ফিরে এলেন মদীনায়।

## আট

ওহুদ– যুদ্ধের শেষে আবু সুফিয়ান বলেছিলো ঃ পরের বছর কুরাইশরা বদর প্রান্তরে আবার আসবে মুসলমানদের শায়েস্তা করার জন্যে। কিন্তু এটা ছিলো তার উত্তেজিত অবস্থার একটা আস্ফালন মাত্র। আসলে রাগের সময় মুখে যা বলা যায়, তা কার্যে পরিণত করা খুব কঠিন হয়। অনেক ক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠে একেবারেই অসম্ভব। তখন হতে হয় লজ্জিত, অনুতপ্ত। আবু সুফিয়ানের অবস্থাও হলো তাই। দলবল নিয়ে মক্কায় ফেরার পর স্থির মাথায় চিন্তা করতে বসলো সে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো ওহূদ যুদ্ধের ভয়াল দৃশ্য, মুসলমানদের বিপুল বল-বিক্রমের ছবি। সে মনে মনে বলতে লাগলো ঃ

'কী বীরত্ব ওই মুসলিমদের! যুদ্ধের ময়দানে এক একটি মুসলমান যেন এক একটি বাঘ। এই বাঘের সাথে বদর প্রান্তরে লড়তে যাওয়া কী মুখের কথা! ওই বদরেই তো আবু জেহেল, ওতবা, শাইবাদের ভবলীলা শেষ হয়েছে। আমারও হতে পারতো। ভাগ্য ভালো– আমি পালিয়ে এসেছিলাম অন্য পথে।'

এসব ভেবে চিন্তে বড়ই লজ্জিত হলো আবু সুফিয়ান। ধিক দিলো নিজের নির্বুদ্ধিতাকে। সে নিজে নিজে আবাব বলে চললো ঃ

"যে অঙ্গিকার আমি ওহূদের ময়দানে করে এসেছি, তা তাড়াতাড়ি পূরণ হবার নয়। এর জন্যে বিরাট প্রস্তুতি দরকার। আর সে প্রস্তুতির জন্যে দরকার অনেক সময়ের। কিন্তু আমি যে অঙ্গিকারাবদ্ধ! আমি যে কুরাইশ

কূলের নেতা! নিজের গোত্রের কাছে মুখ দেখাবো কি করে? মুসলমানরাও বা ভাববে কি? ভাববে, আবু সুফিয়ান ভীরু, কাপুরুষ। তার কথার কোনো মূল্য নেই। সে কথা দিয়ে কথা রাখে না।"

অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান আবু সুফিয়ান এসব ভেবেই পরের বছর বদর প্রান্তরে আর যুদ্ধ করতে গেলো না। গেলো শুধু যুদ্ধের অভিনয় করতে। যাতে মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীরা ভয় পেয়ে যান; আর সেই সাথে নিজের প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হয়। কিন্তু সে উদ্দেশ্যও তার সফল হয়নি। মুহাম্মদ (সা.) অবিশ্বাসীদের ভয় পাননি আদৌ। বরং আবু সুফিয়ানের আস্ফালনের উপযুক্ত জবাব দিতে তিনি আগেই হাজির হয়েছিলেন বদর প্রান্তরে।

আবু সুফিয়ান মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়েছিলো বদরের কাছাকাটি গিয়েই। সাথে সাথে কেঁপে ওঠে তার অবিশ্বাসী অন্তর। আর এগুতে সাহস করেনি সে। ফিরে এসেছিলো সৈন্যদের নিয়ে। দেশে দুর্ভিক্ষের অজুহাত দেখিয়ে।

সেই থেকে লজ্জা, ক্ষোভ আর অপমনে জ্বলতে লাগলো আবু সুফিয়ানের শরীর। ফলে বেশি দিন আর চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব হলো না তার পক্ষে। আবার মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার আয়োজনে মেতে উঠলো সে। দূত পাঠাতে লাগলো দিকে দিকে। ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইলো গোটা আরব অবিশ্বাসীদের।

কুরাইশ নেতার এ আহ্বানে ব্যাপক সাড়া দিলো অবিশ্বাসীরা। সাড়া দিলো ইহূদী, বেদুঈন– সবাই। তারা মক্কায় আসতে লাগলো দলে দলে। যোগাযোগ শুরু করলো কুরাইশদের সাথে।

প্রথমে এলো বনু নাযির ও ওয়াইল গোত্রের একটি সম্মিলিত প্রতিনিধি দল। কুরাইশদের মদীনা আক্রমণের আহ্বান জানালো তারা। এ কাজে তারা নিজেদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাসও দিলো। এ দলের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা ছিলো– বনু নাযির গোত্রের সালাম ইবনে আবুল হুকাইক, হুয়াই ইবনে আখতার, কিনানা ইবনে আবুল হুকাইক এবং ওয়াইল গোত্রের হাওয়া ইবনে কায়েস ও আবু আম্মার। তারা আরবের বহু গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ

করেছিলো রাসূলুল্লাহর (সা.) ওপর আক্রমণ করার জন্যে। কুরাইশরা তাদেরকে বললো ঃ

'হে ইহূদীরা, তোমরা তো প্রথম কিতাবের অধিকারী?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের সাথে মুহাম্মদের যে বিষয় নিয়ে মতভেদ তা তোমরা ভালো করেই জানো?'

'জানি।'

'এখন তোমরাই বলো, আমাদের ধর্ম ভালো না মুহাম্মদের ধর্ম ভালো?'

'তোমাদের ধর্ম মুহাম্মদের ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তোমরাই সত্যের পতাকাবাহী।' বললো ইহূদীরা।

ইহূদীদের মুখে এরূপ প্রশংসা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো কুরাইশরা। ভাবলো ঃ

'ইহূদীরাই তো আমাদের একান্ত আপনজন, দুর্দিনের বন্ধু। তাই তো আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে তারা। এবার উভয়ের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে আক্রমণ চালাবো মদীনার ওপর। নিশ্চিহ্ন হবে মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীরা। মুছে যাবে দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম ও নিশানা'।

এরপর বনু নাযিরের ইহূদীরা গেলো গাতফান গোত্রের কাছে। তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে আমন্ত্রণ জানালো। আসাদ গোত্রের সাথে গাতফান গোত্রের মিত্রতা ছিলো। তারাও যুদ্ধের জন্যে তৈরি হলো। আবার সুলায়ম গোত্রের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিলো কুরাইশদের। প্রস্তুত হলো তারাও। এ শত্রু সংঘ সমবেত হলো মরুভূমির উৎচ্ছৃঙ্খল বেদুঈনরা-ও।

চলতে থাকলো বিপুল রণ প্রস্তুতি। পেরিয়ে গেলো প্রায় একটি বছর। ইসলামের বিরুদ্ধে গড়ে উঠলো বিশাল এক-শত্রু-সমবায়। মুসলমানদের ধ্বংস করতে মদীনা অভিমুখে রওনা হলো তারা। তাদের সঙ্গে চললো দশ হাজার সশস্ত্র সৈন্যের বিরাট এক বাহিনী।

রাসূল (সা.) অনেক আগেই জানতে পেরেছিলেন দুশমনদের এই যুদ্ধ

প্রস্তুতির কথা। সাথে সাথে সামরিক শক্তি সংগঠনেও মনোনিবেশ করেন তিনি। বসলেন পরামর্শ বৈঠকে। সাহাবাদের নিয়ে।

অনেক পরামর্শ ও মতামত বিনিময় হলো। সিদ্ধান্ত হলো ঃ এবার কিছুতেই বাইরে যাওয়া যাবে না। মদীনার ভেতর থেকেই যুদ্ধ করতে হবে। সালমান ফারসী নামের এক প্রবীণ সাহাবা ছিলেন। যাঁর বাড়ি ছিলো পারস্যে। তিনিই বললেন এক অভিনব যুদ্ধ কৌশলের কথা। আর তা হলো মদীনার চারপাশে গভীর পরিখা খনন করা। এর ফলে মদীনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করা সবচে' সহজ হবে। শত্রুপক্ষ কোনক্রমেই অতিক্রম করতে পারবে না সেই পরিখা। যারা অতিক্রমের চেষ্টা করবে, তাদেরকে পরিখার পাশে রাখা পাথর নিক্ষেপ করে অথবা তীর বিদ্ধ করে হত্যা করা যাবে। এই অদ্ভুত পরিকল্পনার কথা ইতোপূর্বে আরবরা কখনো দেখেওনি, শোনেওনি। বিস্মিত হলো সকলেই। নবীজীরও (সা.) বড়ই পছন্দ হলো পদ্ধতিটি। তিনি মত দিলেন সাথে সাথে।

অবিলম্বে শুরু হলো পরিখা খননের কাজ। মদীনার পেছন দিকে 'আলওয়া' পর্বত। কাজেই সেদিকে খননের দরকার নেই। বাকি তিন দিকের সব জায়গায়ও খননের প্রয়োজন হবে না। কেননা, সেসব স্থানে আছে প্রাচীর ও দুর্গ। কাজেই যেসব জায়গা কেবল উন্মুক্ত ছিলো, সেসব জায়গায়ই খননের কাজ চলতে লাগলো। খননকৃত মাটি ফেলা হলো খাদের ভেতরের অংশে। উঁচু করা হলো বাঁধের মতো। সেই বাঁধের ওপর সাজিয়ে রাখা হলো বড় বড় পাথর। মহানবী (সা.) নিজেও সাহাবীদের সাথে খননের কাজে অংশ নিলেন।

দিন-রাত কাজ চললো অবিরাম। দশ দিনের বিরামহীন পরিশ্রমে প্রস্তুত হলো বিরাট এক পরিখা। যা ছিলো প্রায় ছ'হাজার হাত দীর্ঘ, দশ হাত গভীর আর দশ হাত প্রশস্ত।

খুব তাড়াতাড়িই শেষ হলো সমস্ত কাজ। তিন হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হলেন মহানবী (সা.)। নারী ও শিশুদের পাঠিয়ে দিলেন নিরাপদ

দুর্গে। পরিখার আশ পাশের অধিবাসীদের সরিয়ে দেয়া হলো দূরে। তারপর তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন শত্রুদের জন্যে।

এমনি সময় ঘটে গেলো এক অবাঞ্ছিত ঘটনা। বিশ্বাসঘাতকতা করলো বনু কুরাইজার ইহুদীরা। মহনবীর (সা.) সাথে সম্পাদিত সন্ধি বাতিল করলো তারা। যোগ দিলো কুরাইশদের সাথে।

ইহুদীদের এ বিশ্বাসঘাতকতার কথা নবীজীও শুনলেন। আউস ও খাজরাজ গোত্রের দুই প্রবীণ ব্যক্তিকে পাঠালেন তাদের কাছে। তারা গিয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ

'একী শুনছি?' তোমরা নাকি সন্ধি বাতিল করে কুরাইশদের সাথে যোগ দিয়েছো।?'

'হ্যাঁ দিয়েছি, তাতে কি হয়েছে? তোমাদের কোনো কথাই আমরা শুনতে চাই না।' 'কে তোমাদের মুহাম্মদ? কে তোমাদের রাসূল? আমরা তাকেও মানিনা– যাও।' অত্যন্ত উদ্ধতভাবে জবাব দিলো ইহুদীরা।

ফিরে এলো লোক দু'জন। নবীকে (সা.) জানালো সবকথা। ইহুদীদের এরূপ আচরণে বড়ই ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হলেন নবী। তিনি এটাও বুঝলেন, মদীনার উপকণ্ঠের যে দিকটায় ইহুদীদের বাস, সেদিকটাই এখন অরক্ষিত হয়ে গেলো। যুদ্ধকালে এদিক দিয়ে বিপদ আসতে পারে। হতে পারে ওহুদ যুদ্ধের মতো অবস্থাও। তাই তিনি পাচশ' সৈন্যকে দু'জন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে এই এলাকা টহল দিতে নিযুক্ত করলেন। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পাহারা দিতে লাগলো তারা।

এদিকে আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে ওহুদ প্রান্তরে এসে অবস্থান নিলো। সে ভাবলো মুসলিম বাহিনী সংবাদ পেয়ে আগের মতোই এখানে এসে তাদেরকে বাধা দেবে। তাই সে অপেক্ষা করতে লাগলো। কয়েকদিন কেটে গেলো। তবু মুসলিম বাহিনী গেলো না। তখন সে ভাবলো ঃ মুসলমানরা ভয় পেয়েই এবার আর আসেনি। তাই দ্বিগুণ উৎসাহে সে মদীনা আক্রমণের

জন্যে এগিয়ে এলো। কিন্তু নগরীর উপকণ্ঠে এসেই বিস্ময়ে হতবাক হলো সে। হতভম্ব সবাই। 'একী! এ যে বিরাট পরিখা! গভীর করে কাটা খাদ। এক ধাপও সামনে এগিয়ে যাবার উপায় নেই। ভেতরে পড়লে আর রক্ষা নেই। পরিখার প্রাচীরের ওপর সাজানো বড় বড় পাথর। তারই ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়ানো তীরন্দাজ সৈন্যরা। এগুতে চাইলে পাথর, তীর অথবা বর্শার আঘাতে ধরাশায়ী করবে।'

দশ হাজার সৈন্যের সম্মিলিত শক্তি এই পরিখার কাছে একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেলো। আবু সুফিয়ান কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারলো না। বাধ্য হয়ে সেখানেই তাঁবু খাটালো। কোনো কাজ নেই। শুধু হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা।

দিন কাটতে লাগলো। ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো সৈন্যরা। একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু কী করবে তা বুঝতে পারছে না তারা। এতো কাছে মুসলিম সৈন্যরা, অথচ কিছুই করা যাচ্ছে না। সামনে একটা পরিখা মাত্র। কিন্তু তা যেন হাজার হাজার মাইল দূরে সরিয়ে রেখেছে দু'দলের সৈন্যদের।

বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়। শত্রুদের খাদ্য গুদামেও টান পড়লো। এদিকে আবার শুরু হয়েছে প্রচণ্ড শীত। হাড় কাঁপানো সে শীত। তার ওপর যদি খাদ্য সংকট দেখা দেয়, তবে আর উপায় নেই। আবু সুফিয়ান ভাবলো, যা করা দরকার তা এখনই করতে হবে। তাই সে তার সৈন্যদের দূর থেকে পাথর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলো। নেতার আদেশে সৈন্যরা শুরু করলো তাই। কিন্তু এতে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা গেলো না। তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেবল দেখতে লাগলো শত্রুপক্ষের এই নিষ্ক্রিয় কাণ্ড।

তীর নিক্ষেপ অভিযান অর্থহীন হলো শত্রু বাহিনীর। আলোচনায় বসলো আবু সুফিয়ান, খালিদ বিন ওয়ালীদ, আমর বিন আস প্রমুখরা। সিদ্ধান্ত হলো পরিখা পার হবার। সেই অনুযায়ী অনেক চেষ্টাও করলো তারা। কিন্তু পারলো না সেই গভীর পরিখা পার হতে।

এবার তারা সন্ধান নিতে লাগলো পরিখার সবচে' অপ্রশস্ত স্থানের। খোঁজ

নিয়ে দেখলো, 'সাল' পাহাড় সংলগ্ন জায়গাটি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। আক্রমণের সুবিধার জন্যে এই জায়গাটিই উপযুক্ত মনে করলো তারা। এখান থেকেই পার হলো আমর ইবনে আবদে ওয়াদ ও নওফেল নামের দুই বীর। একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে।

বীরত্বের জন্যে গোটা আরব জুড়ে আমর ইবনে আবদে ওয়াদের নাম ছিলো। সে নাকি এক হাজার সৈন্যের সমকক্ষ। সেই আমর পরিখা পার হয়েই হুঙ্কার দিলো ঃ

'কে আছো যোদ্ধা? এসো, আমার সামনে এসো।"

আমরের এই আস্ফালনে শেরে খোদা আলী (রা.) ততোধিক হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'এক্ষুণি আসছি। একটু অপেক্ষা করো।'

একথা বলেই হযরত আলী (রা.) শ্রদ্ধাভরে তাকালেন নবীজীর (সা.) দিকে। নবী নিজ হাতে পাগড়ী বেঁধে দিলেন তাঁর মাথায়। তারপর তরবারি হাতে দিয়ে হাসিমুখে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিলেন।

আলী মুখোমুখি হলেন আমরের। গর্বিত আমর মাথা উঁচু করে আলীকে বললো ঃ

'যদি কোনো ব্যক্তি আমাকে তিনটি প্রস্তাব দেয়, তবে আমি যে কোনো একটি মেনে নিতে বাধ্য হই।'

'আচ্ছা বেশ– তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।'

'না, এটা কস্মিন কালেও হবে না।'

'তবে তুমি যুদ্ধ করো না! তরবারি কোষ বদ্ধ করে ফিরে যাও।'

'আমি কুরাইশ মহিলাদের তিরস্কার সইতে পারবো না।'

'তাহলে আমার সাথে যুদ্ধ করো।'

যুদ্ধের আহ্বান জানালেন আলী। আলীর আহ্বানে চোখ কপালে তুললো আমর। তাচ্ছিল্যের সাথে বললো, 'একজন সাধারণ সৈনিকের সাথে কী যুদ্ধ করবো আমি। আমার মতো বীর এই আকাশের নিচে আর কেউ নেই।

আচ্ছা বেশ, আমি সম্মত আছি। কিন্তু ঘোড়ার ওপর বসে দুর্বল পদাতিকের সাথে যুদ্ধ করা বীরের শোভা পায় না।'

এই বলে ঘোড়া থেকে নামলো আমর। তরবারি দিয়ে নিজের ঘোড়ার পা দু'খানা কেটে ফেললো সে। তারপর আলীকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

'তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? কে তুমি? পরিচয় দাও।'

'আমি আলী।'

'আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করতে চাই না।'

'কিন্তু আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করতে চাই।'

আলীর কথা শুনে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলো আমর। তরবারি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানলো আলীকে। আলী নিজের ঢাল দিয়ে তা প্রতিহত করলেন। তারপর যুলফিকর দিয়ে আমরের কাঁধ লক্ষ্য করে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। সে আঘাত সইতে পারলো না আমর। দু'টুকরো হয়ে পড়ে গেলো জমিনে। আলী তখন তরবারি উঁচু করে বলে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবর'। সবাই বুঝতে পারলো নিহত হয়েছে মহাবীর আমর।

এরপর মুসলিম বাহিনী 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে লাগলো, বার বার। মুহূর্মু সেই জয় ধ্বনিতে কেঁপে উঠলো অবিশ্বাসীদের অন্তরাত্মা। সামনে আর এগুতে সাহস পেলো না তারা। পালাতে লাগলো প্রাণ নিয়ে। নওফেল পালাতে গিয়ে পড়ে গেলো পরিখার ভেতরে। মুসলিম বাহিনী পাথর মারতে লাগলো তার ওপর। তখন সে বুঝলো, এই পাথরের নিচে রচিত হবে তার কবর। তাই সে চিৎকার করে বলতে লাগলো ঃ

'তোমরা আমাকে এভাবে কুকুরের মতো মেরো না। আমি ভদ্রোচিত মৃত্যু চাই।'

তখন হযরত আলীই (রা) নামলেন পরিখার নিচে। তরবারি দিয়ে নিহত করলেন নওফেলকে। এরপর দিশেহারা হয়ে পড়লো শত্রুরা। সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হয়ে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করলো মুসলিম বাহিনীকে। কিন্তু সারাদিন চেষ্টা করেও মুসলিম বেষ্টনী ভেদ করতে পারলো না কাফিরের দল।

যুদ্ধে কোনো সফলতাই পেলো না শত্রুপক্ষ। ফলে হতাশা এসে বাসা বাঁধলো তাদের মনে। যুদ্ধের তীব্রতা শিথিল হয়ে এলো, দ্রুত। শত্রু শিবিরে দেখা দিলো আত্মকলহ। আবু সুফিয়ান ভেবেছিলো, যুদ্ধ দু'এক দিনেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রায় এক মাস হতে চললো, জয়-পরাজয় কিছুই হলো না। শুধু শুধু অন্ন ধ্বংস করছে দশ হাজার সৈন্য।

এদিকে বনু কুরাইজার ইহূদীরাও হতাশ করলো কুরাইশদের। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যুদ্ধে যোগ দিলো না তারা। আসলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে সাহস পায়নি ওরা। আবু সুফিয়ান এই অনীহার কারণ জানতে লোক পাঠালো ওদের কাছে। ইহূদীরা বললো ঃ

'আজ শনিবার। আমাদের উপাসনার দিন। তাই আমরা কোনো মতেই যুদ্ধ করতে পারবো না আজ।'

এ খবর পেয়ে একবারে মন ভেঙ্গে গেলো আবু সুফিয়ানের। সে মনে মনে বলতে লাগলো, 'যা হবার তা তো হয়েছে। আর নয়, ফিরে যেতে হবে এবার।'

অবরোধের সাতাশ দিন পার হলো। এলো কালো রাত্রি। প্রচণ্ড শীতের সে রাত। উন্মুক্ত ময়দান। এরই মধ্যে আরেক বিপদের আশঙ্কা। ঈশান কোণে কালো মেঘের ঘনঘটা। ক্রমেই জমে উঠলো সে মেঘ। তারপর ঝড় উঠলো প্রবল বেগে। প্রচণ্ড সেই মরু সাইমুনে তছনছ হয়ে গেলো কুরাইশদের সেনা ছাউনি। এরপর এলো মুষলধারায় বৃষ্টি। তখন খোলা আকাশের নিচে পাগলের মতো ছুটাছুটি করতে লাগলো দশ হাজার সৈন্য। নিভে গেলো শিবিরের আগুন। নষ্ট হলো সব খাদ্য সামগ্রী।

এমনি সংকট সন্ধিক্ষণে আবু সুফিয়ান উঠলো ঘোড়ার পিঠে। সংকেত দিলো সৈন্যদের ফিরে যাবার জন্যে। তারা তখন ক্লান্ত, অবসন্ন। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত তাদের ঘোড়াগুলোও। তবু তাদের পিঠে সওয়ার হলো তারা। চুপে চুপে পালিয়ে গেলো মক্কার পথে।

পরদিন দেখা গেলো ময়দানে শত্রু সৈন্য নেই, একটিও। আছে শুধু

তাদের সকরুণ স্মৃতি ঃ ছেড়া তাঁবু, লন্ডভন্ড রসদপত্র আর চুলার ভেজা ছাই এর স্তূপ।

মাত্র এক রাতের ব্যবধান। কিন্তু কত পরিবর্তন! কাল যেখানে কাফিরেরা নাগিনীর মতো বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলেছে, রক্তের হোলি খেলায় মেতেছে, বিচরণ করেছে অহঙ্কারে, আজ সেখানে প্রবাহিত হচ্ছে সত্য-সুন্দরের অনাবিল হাওয়া।

কে আনলো এই পরিবর্তন? মহান আল্লাহ। এসবই সেই মহাপ্রভুর করুণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরিখার যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আবু সুফিয়ান আবারও তার দলবল নিয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু তখনো মদীনা পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হয়নি। এখানে আজও বিস্তার করে আছে বনু কুরাইজার ইহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতার কালো থাবা। বড়ই কপট ও বিশ্বাসঘাতক এরা। বারবার এরা চুক্তি লঙ্ঘন করেছে, যোগ দিয়েছে কুরাইশদের দলে। পরিখার যুদ্ধের পটভূমিও তৈরি করেছিলো এরাই। তাই মহানবী (সা.) এবার দৃষ্টি দিলেন এদের দিকে। সাহাবীদের আদেশ করলেন ঃ ‘প্রস্তুত হও। বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে অভিযানে যেতে হবে।’

যুদ্ধের কষ্ট তখনো দূর হয়নি। ক্লান্তি ও অবসাদ সৈন্যদের শরীর ও মন জুড়ে। সব ক্লান্তি, সব অবসাদ মুছে ফেললো তারা। সাড়া দিলো রাসূলে খোদার (সা.) আহ্বানে। বেরিয়ে পড়লো অভিযানে। সবার আগে চললেন শেরে খোদা আলী (রা.)। হাতে তাঁর কলেমার পতাকা। উড়ছে পত পত করে। তাঁর পেছনে তিন হাজার নিবেদিত প্রাণ সাহাবীর দল!

মুসলিম বাহিনী এসে গেলো বনু কুরাইজার আবাস স্থলে। অবরোধ করলো তাদেরকে। এই অতর্কিত অবরোধে হতাশ ও দিশেহারা হয়ে পড়লো ইহূদীরা। নিরুপায় হয়ে দুর্গে আশ্রয় নিলো তারা। দুর্গও অবরোধ করলো মুসলিম সেনারা।

দিন কাটতে লাগলো। অবরুদ্ধ অবস্থায় আর ক'দিন থাকা যায়। বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করতে চাইলো তারা। দূত পাঠালো রাসূলের (সা.) কাছে।

বললো, 'আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমরাও বনু কাইনুকা ও বনু নাযির গোত্রের মতো এদেশ ছেড়ে চলে যাবো।'

মহানবী (সা.) এবার প্রত্যাখ্যান করলেন তাদের আবেদন। বন্দী করার আদেশ দিলেন সবাইকে।

ইহূদীরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। বুঝতে পারলো, এবার প্রাণ বাঁচানো দায়। তবু শেষ চেষ্টা করলো তারা। ফয়সালা কামনা করলো এক নিরপেক্ষ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির।

লোকটির নাম সা'দ বিন মাজ (রা.)। আউস গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি তিনি। তাঁকেই বিচারক মানলো তারা। ইসলামের আগে আউস গোত্রের সাথে বনু কুরাইজার খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। তাই তারা ভাবলো, সা'দকে বিচারক নিযুক্ত করলে, তিনি নিশ্চয় তাদের প্রতি সদয় হবেন। তাদের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তাই তারা বললো ঃ 'সাদ যে রায় দিবেন, আমরা তাই মেনে নেবো।'

রাসূলে খোদা (সা.) রাজী হলেন তাদের প্রস্তাবে। ডেকে পাঠালেন সা'দকে। তিনি তাঁকে বললেন, 'ইহূদীরা তোমাকে বিচারক নিযুক্ত করেছে। তুমি যে দণ্ড বিধান করবে তাই তারা মেনে নেবে। আমিও তা মেনে নেবো।'

বসে গেলেন সা'দ বিচার-আসনে। সমবেত সবাই। এক পাশে ইহূদীরা। উৎকণ্ঠায় প্রহর গুণছে। অন্য পাশে রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা। দারুণ শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। কারো মুখে কথা নেই। নিবিড় নীরবতা চারিদিকে। রায় শোনার অপেক্ষায় সবাই। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলেন সা'দ। ঘোষণা করলেন বিচারের রায়। ইহূদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ঃ

'কোন দলের সাথে বিরোধ দেখা দিলে প্রথমে তাদের সন্ধির জন্যে আহ্বান করো। যদি তারা সে আহ্বানে কান দেয় এবং সন্ধি করতে রাজি হয়, তবে তাদের মিত্ররূপে গ্রহণ করো। যদি তারা না শোনে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। যুদ্ধে তারা পরাজিত হলে তাদের পুরুষদের হত্যা করো, স্ত্রী-পুত্র ও

বালক-বালিকাদের দাস-দাসী হিসেবে ব্যবহার করো এবং তাদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নাও।'

রায় শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলো ইহূদীরা। কোনো কথাই বের হলো না তাদের মুখ দিয়ে। করুণ মৃত্যুর ছবি ভেসে উঠলো তাদের চোখের সামনে। বলার কিছুই ছিলো না। কেননা নিজেদের ধর্মগ্রন্থে যখন এই অপরাধের জন্যে মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত তখন দোষ দেবে কাকে। পক্ষপাতিত্বই বা বলবে কী করে? বিচারের খড়গ মাথা পেতে নিতেই হবে।

রায় অনুযায়ী ইহূদী পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো, আর নারী, শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা সবাই দাস-দাসী হিসেবে গণ্য হলো এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি বিলি করে দেয়া হলো সেনা বাহিনীর মধ্যে।

এভাবে এক এক করে ইহূদীদের তিনটি গোত্রই উৎখাত হলো মদীনা থেকে। কুচক্রীদের কবল থেকে আপাতত রক্ষা পেলো মদীনাতুল ইসলাম। অথচ একদিন এই ইহূদীরাই চেয়েছিলো সবার আগে আখেরী নবীর (সা.) উম্মত হতে। শুধু এই উদ্দেশ্যেই তারা স্মরণাতীত কাল থেকেই বসবাস করছিলো মদীনা নগরীতে। অপেক্ষা করছিলো যুগ যুগ ধরে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যখন সত্যি সত্যিই শেষ নবীর (সা.) আবির্ভাব হলো, তিনি যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন সেই ইহূদীরাই প্রথম বিরোধিতা করলো তাঁর। শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে বিতাড়িত হলো মদীনা থেকে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস!

পরিখার যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয়ে ইসলামের মর্যাদা আরো বেড়ে গেলো। প্রমাণিত হলো, গোটা আরবের মিলিত শক্তির কাছেও ইসলাম অপরাজেয়। তাকে দমন করার সাধ্য কারো নেই। তখন থেকে এই নতুন আলোকিত ধর্ম আরো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো চারিদিকে। আরব উপদ্বীপের অবিশ্বাসীরা তাদের পুরনো বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলামের শিবিরে প্রবেশ করতে লাগলো, দলে দলে।

## নয়

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছে পাঁচটি বছর– হিজরি সন এসে পড়েছে ষষ্ঠ শতকে। মদীনার ভেতরের শত্রু নেই বললেই চলে, তাই আঘাতের আশঙ্কা থেকে মুক্ত প্রিয়নবী (সা.) ও তাঁর প্রিয় সাহাবারা। জীবন যাপনে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাভাবিকতা, সুস্থিতি, আনন্দ। তবু এতো কিছুর মাঝেও মুহাজিরদের বুকের মধ্যে বয়ে গেছে এক অসীম অপূর্ণতা। পিতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন এ জীবন, সেই সঙ্গে পবিত্র গৃহ কা'বায় হজ্জ পালন করা হয়নি কয়েকটি বছর। জীবনের এক না-পাওয়া তাদের জীবনকে অনেকটা অস্থির করে তোলে। কুরাইশদের নির্যাতন, যুদ্ধ-বিগ্রহ– এসব কিছুর পরেও তাই হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া আশা জাগে জন্মভূমি মক্কায় ফিরে যেতে, পূত-পবিত্র কা'বা ঘরে হজ্জ সমাপন করার ইচ্ছা হয় সবার। তাই একদিন বুকভরা ব্যথা নিয়ে সাহাবারা তাঁদের প্রিয় নবীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আর কা'বা শরিফে হজ্জ করতে পারবো না?'

'ধৈর্য ধরো, আল্লাহ নিশ্চয় তোমাদের মনের আশা পূরণ করবেন।' সবাইকে সান্ত্বনা দিলেন নবীজী।

দিন পার হয়। একদিন নবী (সা.) স্বপ্ন দেখলেন ঃ তিনি খানায়ে কাবায় হজ্জ ব্রত পালন করছেন, অনুসারীদের নিয়ে। এরপর তাঁরও মন হয়ে উঠলো উতলা। পবিত্র কা'বা যিয়ারতের জন্যে, প্রিয় পিতৃভূমিকে এক নজরে দেখার জন্যে। একদিন তিনি ডাকলেন সাহাবাদের। আবেগভরা কণ্ঠে বললেন ঃ 'আমি এ বছর হজ্জের কাজ সম্পন্ন করতে মক্কায় যাব। তোমরা চাইলে আমার সঙ্গী হতে পারবে।' শুনে খুশিতে ভরে গেলো সাহাবাদের মন। তৈরি হতে লাগলেন তাঁরাও।

জিলকদ মাস। অতি পবিত্র সময়। আরবে রক্তপাত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং যুদ্ধ-বিগ্রহের কোনো আশঙ্কা নেই। এই সুযোগেই হজ্জ ব্রত পালন করতে যাচ্ছেন শান্তি প্রিয় নবী (সা.)। জন্মভূমি মক্কায়।

নির্দিষ্ট দিনে আল-কাসওয়া উটের পিঠে সওয়ার হলেন তিনি। যাত্রা করলেন ওমরার উদ্দেশ্যে। ভক্ত সাহাবাদের নিয়ে। সঙ্গে সত্তরটি কুরবানির উট।

চৌদ্দশ' হজ্জ যাত্রী লাব্বায়েক! লাব্বায়েক! বলতে বলতে এগিয়ে চলেছেন, নবীর (সা.) পিছু পিছু। তাদের মনে কোনো অভিসন্ধি নেই, নেই কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের অভিলাষ। তাই যুদ্ধ উপকরণও নেই তাদের সঙ্গে। আছে শুধু আত্মরক্ষার কোষবদ্ধ তরবারি।

এদিকে নবীজীর আগমনের খবর পৌঁছে গেলো মক্কায়। এ সময় কারো মনে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ জাগার কথা নয়। তবু জিঘাংসায় মতে উঠলো কুরাইশরা। মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্যে বদ্ধপরিকর হলো তারা। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও ইকরামা ইবনে আবু জেহেলের নেতৃত্বে পাঠালো একদল অশ্বারোহী সৈন্য। কুরাউল গামীম উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছালো সে সেনাবাহিনী।

ওদিকে মক্কার কাছাকাছি উসফানে পৌঁছালেন মহানবী (সা.)। দেখা হলো বিশর ইবনে সুফিয়ান কাবীর সাথে। সে কুরাইশদের এই প্রতিবন্ধকতার কথা জানিয়ে দিলো নবীকে (সা.) ঃ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিকটেই কুরাইশ বাহিনী সমবেত হয়েছে। আপনার সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে তারা। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে কিছুতেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না।'

'ধিক কুরাইশদের! জঙ্গী মনোভাব গ্রাস করে ফেলেছে তাদেরকে। আমাকে গোটা আরববাসীর সাথে একটু আলোচনা করার সুযোগ দিলে ওদের অসুবিধা কোথায়?' আফসোস করেন নবীজী।

আসন্ন যুদ্ধাবস্থা এড়ানোর কথা ভাবলেন নবী। তাই এগুতে চাইলেন অন্য পথে। বললেন, 'এমন কেউ কি আছো যে আমাদের কুরাইশদের আগলে রাখা পথ থেকে অন্য পথে মক্কায় নিয়ে যেতে পারবে?'

'আমি পারবো'। বলে উঠলো এক ব্যক্তি।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো মুসলমানদের। দুর্গম পাহাড়ী সে পথ। চলাচলে ভীষণ কষ্ট। সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে সাহাবীদের নিয়ে এগিয়ে চললেন নবী। অবশেষে তাঁরা মক্কার নিম্নভূমি হুদাইবিয়ায় এসে উপনীত হলেন। যাত্রা বিরতি করলেন এখানে।

এখানেই নবীজীর (সা.) সাথে কথা বলতে এলো মক্কার খোজা গোত্রের

বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা। কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো সে। নবীকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

'আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?'

'আমি কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে আসেনি। এসেছি শুধু পবিত্র কা'বা যিয়ারত ও তার প্রতি সম্মান দেখাতে।'

'কিন্তু কুরাইশরা কিছুতেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। এ অবস্থায় আপনি কি করবেন?'

'তুমি তাদের গিয়ে বলো, আমরা যুদ্ধ করতে আসেনি। হজ্জ করতে এসেছি। এটা তো পবিত্র মাস। এ মাসে কেউ কারো সাথে যুদ্ধ করে না। তবে কেন তারা আমাদের আক্রমণ করবে?'

মক্কায় ফিরে এলো বুদাইল। কুরাইশদের বললো সব কথা। আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো তারা। বললো ঃ 'যদি সে যুদ্ধ করতে না এসে থাকে তবুও আমরা তাকে কখনো জবরদস্তিমূলকভাবে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবো না। সাধারণ আরবরাও এ কথা জানে যে, মক্কাবাসী কখনো কাউকে এ শহরে জোরপূর্বক ঢুকতে দেয়নি।'

এরপর কুরাইশরা আরো কয়েকজন প্রতিনিধিকে পরপর পাঠালো রাসূলের কাছে। তিনি প্রত্যেককে ওই একই কথা বললেন ঃ হজ্জ করতে যাচ্ছেন তিনি, যুদ্ধ করতে নয়। তবু নমনীয় হলো না মক্কার অবিশ্বাসীরা। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের কাছে পাঠালেন হযরত ওসমান ইবনে আফফানকে (রা.)।

চলে গেলেন ওসমান (রা.)। রাসূলের বার্তা পৌঁছে দিলেন কুরাইশদের কাছে। কিন্তু তারা তাঁর কথাও শুনলো না। বরং আটকে রাখলো তাঁকে। এদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়লো ঃ কুরাইশরা ওসমানকে হত্যা করেছে।

ওসমানের শহীদ হবার সংবাদে দারুণ মর্মাহত হলো মুসলিমরা। ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেলো তাদের। নবীজীও খুব রেগে গেলেন। ওসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইলেন তিনি। লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হতে বললেন সাহাবীদের। একটি বাবলা গাছের তলায় বসে শপথ নিলেন সবার কাছ থেকে ঃ 'কুরাইশদের সাথে লড়াই না করে স্থান ত্যাগ করবো না।'

অবস্থা অনুভব করলো অবিশ্বাসীরা। শেষ পর্যন্ত তারা ছেড়ে দিলো ওসমানকে। সাথে সাথে রাসূলের (সা.) কাছে পাঠালো সুহাইল ইবনে আমরকে। সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে। সে এসেই শুরু করলো আপোষ রফার আলোচনা। কঠিন শর্ত আরোপ করলো কয়েকটি। যা ছিলো মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত অবমাননাকর ও পরাজয়মূলক। সন্ধির শর্তগুলো ছিলো এমনিঃ

১. মুসলমানরা এ বছর হজ্জ না করেই মদীনায় ফিরে যাবে।

২. আগামী বছর তারা হজ্জ করতে পারবে, তবে তিন দিনের বেশি মক্কায় থাকতে পারবে না। এ সময় কুরাইশরা মক্কা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে।

৩. ওই সময় মুসলমানরা কোনো অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে না, আনতে পারবে শুধু একখানা করে কোষবদ্ধ তরবারি।

৪. হজ্জের সময় মুসলমানদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা হবে।

৫. মক্কায় অবস্থানকারী কোনো লোককে মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় নিয়ে যেতে পারবে না।

৬. যদি কোনো কুরাইশ মুহাম্মদের সাথে যোগ দেয়, তবে তার অভিভাবক তাকে ফেরত চাইলে ফেরত দিতে হবে, কিন্তু কোনো মুসলমান কুরাইশদের দলে যোগ দিলে কুরাইশরা তাকে ফেরত দেবে না।

৭. আরবের যে কোনো গোত্র মুসলমান অথবা কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারবে।

৮. কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ দশ বছরের জন্যে বন্ধ থাকবে।

সন্ধি চুক্তির সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হয়ে গেছে। শুধু লিখিত রূপ নিতে বাকি। এমন সময় ধৈর্যহারা হয়ে উঠলেন হযরত ওমর (রা.)। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগলেন তিনি। এক সময় ছুটে এলেন রাসূলের (সা.) কাছে। বললেন ঃ

'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা কি মুসলিম নই?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা কি মুশরিক নয়?'

'হ্যাঁ।'

'তবে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের প্রশ্নে এই অবমাননা বরদাশত করতে যাচ্ছি?'

'আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তাঁর নির্দেশ আমি কখনো লঙ্ঘন করবো না। আর তিনি আমাকে কখনো বিপথগামী করবেন না।' দৃঢ়ভাবে বললেন নবীজী।

বেশিরভাগ সাহাবীর অমত থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) মেনে নিলেন সেই অসম চুক্তির সন্ধি। লিখিতরূপ পেলো তা। তারপর নবীর সীলমোহর অঙ্কিত হলো তাতে।

বাস্তবে মুসলিম পক্ষ এ থেকে একেবারে কম সুবিধা পেলেও এর পরিণতি ছিলো সুদূর পরিসরের। মুসলমানদের প্রথম প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি এলো এ সন্ধির মাধ্যমে। আগামী দিনের মহাবিজয়ের স্বর্ণালী সোপান তৈরির এক মজবুত ভীত তৈরি হলো এর মধ্যদিয়ে। কেবল বাইরের নয়, ভেতরের শক্তিও রয়েছে এতে, যা অনাগত দিনের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের রক্ষা কবচ হিসেবে চিহ্নিত। আর মহাপ্রভুর স্বীকৃতিই তো এর মূল ভিত্তি। ইসলামের বিজয় ধারায় এই সন্ধি চুক্তি যতোই অবমাননাকর ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হোক না কেন আগামী দিনের চলার পথে তার শুভ সূচনা হয়েই রইলো।

মহানবীর (সা.) অনেক সঙ্গীই ভেতরে ভেতরে অখুশি হলেন। ফিরে যেতে মন সরছিলো না তাঁদের। তাৎক্ষণিকভাবে মন সায় দিচ্ছিলো না। এ যেনো বিজয় নয়, পরাজয়ের এক গ্লানিময় উপাখ্যান। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মানা-না-মানার মানসিক কষ্ট নিয়ে পার হলো তিনদিন-তিনরাত। হুদাইবিয়ার উষর মরু প্রান্তর ছেড়ে একে একে বেরিয়ে এলেন মহানবী (সা.), সাহাবারা (রা.)। মহাপ্রভুর প্রতি একান্ত নির্ভর, মহানবীর একান্ত সহযোগ কামনা করে সবাই এগুতে লাগলেন মদীনার দিকে। এই বিজয়ের সুসংবাদে অবতীর্ণ হলো পবিত্র কুরআনের সেই বিখ্যাত বাণী ঃ

'হে মুহাম্মদ (সা.)! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করলাম।' (সূরা আল-ফাতহা ঃ ১)

## দশ

এতোদিন কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে ছিলো চরম শত্রুতা, যুদ্ধাবস্থা। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে সে অবস্থা দূর হলো। দশ বছরের জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধের চুক্তি হওয়ায় রক্তপাতের আশঙ্কা আর রইলো না। ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা নিরাপদ হলো। মক্কা ও মদীনার মধ্যে আবার যোগাযোগ শুরু হলো। অমুসলিমরা মুসলিমদের নিবিড় সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেলো। ইসলাম প্রচারে আর কোনো বাধাই থাকলো না। তখন রাসূল (সা.) আরবের বাইরেও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সুযোগ পেলেন।

রাসূল (সা.) শুধু আরব দেশের জন্যে নবী হয়ে আসেননি, এসেছেন গোটা বিশ্বের জন্যে। বিশ্বনবী তিনি। সুতরাং তাঁর কর্মক্ষেত্রও বিশ্বব্যাপী। তাই তো হুদাইবিয়ার সন্ধির পরেই একদিন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে বললেন ঃ 'হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ্ আমাকে সারা বিশ্বের জন্যে রহমত ও পয়গম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছেন। সাবধান! হযরত ঈসার (আ.) হাওয়ারীদের মতো তোমরা মতভেদ করো না। যাও, আমার পক্ষ থেকে দিকে দিকে সত্যের বাণী পৌঁছে দাও।'

বিশ্বনবীর (সা.) আদেশ পেয়ে দিগ দিগন্তে ছুটে চললেন সাহাবীরা। সত্যের শাশ্বত সওগাত নিয়ে। মানব মুক্তির মহাসনদ তাওহীদের বার্তা নিয়ে। রোম, পারস্য, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে দেশে পৌঁছে দিলেন ইসলামের চিরন্তন বাণী।

পৃথিবীতে তখন যে ক'টি শক্তিশালী রাজ্য ছিলো, তাদের মধ্যে রোম সাম্রাজ্যই ছিলো প্রধান। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম দিকে এ সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এ সময় রোমকরা পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে এবং এর নাম রাখে 'বাইজানটাইন' সাম্রাজ্য। এ বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন হিরাক্লিয়াস। তাঁর উপাধি ছিলো 'কাইসার'। তিনি কনস্টান্টিনোপলে থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

নবীজী হিরাক্লিয়াসের কাছে দূত পাঠালেন। ইসলামের আহ্বান পত্র নিয়ে

হাজির হলেন সাহাবী দিহইয়া কলবী (রা.)। আরবী ভাষায় লেখা, সীলমোহর যুক্ত একজন অপরিচিত নিরক্ষর মরুবাসীর পত্র বিস্মিত ও কৌতূহলী করলো হিরাক্লিয়াসকে। শেষ নবীর আগমন সংবাদ তিনি আগে থেকেই জানতেন। তাই আরবের এই নবী সম্পর্কে জানতে বড় আগ্রহ হলো তাঁর। তিনি পরামর্শ বৈঠকে বসলেন, পরিষদবর্গকে নিয়ে। সাথে সাথে আদেশ দিলেন, আরবের কোনো লোক পাওয়া গেলে তাকেও পরামর্শ বৈঠকে হাজির করতে। ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেলো ইসলামের ঘোর শত্রু আবু সুফিয়ানকে। রাজ সভায় ডাকা হলো তাকে। সম্রাট রাসূল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তার কাছে। সাথে সাথে তাকে হুঁশিয়ারও করে দিলেন এই বলে ঃ

'যা বলবে, সত্য বলবে। মিথ্যা বললে গর্দান কাটা যাবে।'

আবু সুফিয়ানের ইচ্ছে ছিলো কিছু মিথ্যে বলে হিরাক্লিয়াসের কান ভারি করার, কিন্তু তা পারলো না। শাস্তির ভয়ে সত্যি কথাই বলতে হলো তাকে।

হিরাক্লিয়াস শুনলেন সবকিছু। বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হলেন তিনি। বিশ্বাসের আলোর ছটা এসে পড়লো তাঁর হৃদয়ে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করতে পারলেন না তিনি। পাদ্রী, পুরোহিত ও আমত্যদের ভয়ে। তখন নবীর দূতকে সসম্মানে বিদায় দিলেন তিনি। কিছু মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়ে।

পারস্য সম্রাটের উপাধি ছিলো কিসরা। বিশ্বনবীর (সা.) সময়ে কিসরার নাম ছিলো খসরু পারভেজ। নবীজী ইসলামের দাওয়াত দিলেন তাকেও। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযায়ফা পত্র নিয়ে গেলেন তার কাছে। ভীষণ ক্রোধান্বিত হলেন অগ্নি উপাসক খসরু পারভেজ। হযরতের পত্রখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন তিনি। দূতকেও তাড়িয়ে দিলেন ঘৃণাভরে। শুধু তাই নয়, সাথে সাথে ইয়েমেনের শাসনকর্তা বাজানকে হুকুম দিলেন ঃ

'অবিলম্বে মুহাম্মদকে গ্রেফতার করে আমার সামনে হাজির করো।'

অধীনস্থ শাসনকর্তা সম্রাটের আদেশ পেয়ে মোটেই দেরী করলেন না। গ্রেফতারী পরোয়ানাসহ দু'জন কর্মচারীকে পাঠালেন নবীর কাছে। কর্মচারীরা রাসূলের (সা.) কাছে এসে বললো ঃ

'সম্রাটের আদেশ পালন করুন, নইলে তার সেনাবাহিনী এসে আরব ভূমি দখল করে নেবে।'

'আজ আমি কিছুই বলবো না। কাল এসো, জবাব দেব'।– হাসিমুখে বললেন নবীজী।

একথা শুনে রাজকর্মচারী দু'জন সে দিনের মতো চলে গেলো। অপেক্ষা করলো এক রাত। পরদিন আবার এলো রাসূলের (সা.) কাছে। রাসূল তাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'কার পরোয়ানা?'

'কেন সম্রাট খসরু পারভেজের!'

যাও, তোমাদের খসরু তো জীবিত নেই। গতরাত্রে সে তার পুত্র শেরওয়ারের হাতে নিহত হয়েছে। সিংহাসন দখল করেছে। শেরওয়ার সম্রাটকে গিয়ে বলো, খসরু যেমন করে আমার চিঠি টুকরো টুকরো করে ফেলেছে, আল্লাহ তার রাজ্যকেও তেমনি টুকরো টুকরো করে ফেলবেন। দেখবে, খুব শিগ্‌গীরই ইসলামের রাজ্য সীমা পারস্যের রাজধানী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

নবীর (সা.) কথা শুনে রাজকর্মচারী দু'জন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। আর কিছুই বলার থাকলো না তাদের। বাধ্য হয়ে ফিরে চললো। তখন নবীজী আবার ডাকলেন তাদের। বললেন, 'বাজানকে গিয়ে বলো, সে যেন ইসলাম গ্রহণ করে। তাহলে আমি তাকে পূর্বপদে বহাল রাখবো।'

কর্মচারীদ্বয় ফিরে এলো। ইয়েমেনে পৌঁছেই শুনতে পেলো, সম্রাট খসরু তার ছেলে শেরওয়ার হাতে নিহত হয়েছেন। সিংহাসন দখল করেছেন শেরওয়া। তিনি ইয়েমেনের শাসনকর্তা বাজানকে একটি পয়গামও পাঠিয়েছেন ঃ

'সেই আরবের নবী সম্বন্ধে দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করবে না।'

কর্মচারীরা হাজির হলো বাজানের সামনে। রাসূল (সা.) সম্পর্কে সবকথাই জানালো তাঁকে। প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস এলো বাজানের। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'নিশ্চয় ইনি নবী। ইনি যখন আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন এবং বলেও পাঠিয়েছেন– যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে ইয়েমেনের শাসনকর্তা পদে বহাল থাকব। একথা আমাকে মানতেই হবে। নইলে আমার অকল্যাণ হবে।'

এসব ভেবেই বাজান ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর দেখাদেখি আরো অনেক অগ্নি-উপাসকও শামিল হলো ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে।

এরপর নবী (সা.) ইসলামের দাওয়াত পত্র পাঠালেন আবিসিনিয়ার নাজ্জাশীর কাছে। নাজ্জাশী কারো নাম নয়, বাদশাহের উপাধি। সে সময় আবিসিনিয়ার নাজ্জাশীর নাম ছিলো আসমিয়া। তিনি বিশ্বনবী (সা.) ও তাঁর প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে আগে থেকেই অবগত ছিলেন। নবুওয়াতের পঞ্চমবর্ষে মক্কার মুসলমানরা যখন কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, তখন এই আসমিয়াই ছিলেন শাসন ক্ষমতায়। তিনি মুসলমানদের আশ্রয় দেন। তাঁর আশ্রয়েই দীর্ঘ ছয়টি বছর অতিবাহিত হয় মুসলিমদের। মহানবীর (সা.) পত্র প্রেরণের সময়ও একদল মুসলমান আবিসিনিয়ায় ছিলেন এবং তখনো পর্যন্ত সেই আসমিয়াই ক্ষমতায় ছিলেন।

নাজ্জাশী আসমিয়া রাসূলে খোদার (সা.) পত্রখানা শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করলেন। দূতকেও জানালেন সাদর সম্ভাষণ। তারপর সেখানকার মুসলিমদের নেতা হযরত জাফরের (রা.) হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি রাসূলের পত্রের একটি জবাবও দিলেন, এভাবে ঃ

'আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।'

এরপর রাসূল (সা.) হাতিব (রা.)-কে ইসলামের আহ্বান পত্র দিয়ে পাঠালেন মিসর রাজ মুকাউকিসের কাছে। মুকাউকিসও নবীর দূতকে উপযুক্ত সম্মান দিলেন। নবীর পত্রখানা যত্নের সাথে রেখে দিলেন হাতির দাঁতের তৈরি একটি সুন্দর কৌটার মধ্যে। তারপর তিনি রাসূলের (সা.) জন্যে পাঠালেন কিছু মূল্যবান উপহার। এসব উপহারের মধ্যে ছিলো একটি সাদা রঙের সুন্দর ঘোড়া। যেটা নবীজী নিজে ব্যবহারের জন্যে রেখে দেন এবং এর নাম রাখেন 'দুলদুল'। এই দুলদুলের পিঠে সওয়ার হয়েই রাসূল (সা.) হুনাইনের যুদ্ধে যান।

এভাবে তাহওহীদের বাণী আরবের বাইরে পৌছে গেলো। রোম, পারস্য, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে দেশে এসে পড়লো ইসলামের অতিন্দ্রীয় আলোর ছটা।

আরবের মধ্যেও ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটলো ইসলামের। গোত্রের পর

গোত্র তাদের পুরনো বিশ্বাস ত্যাগ করে দাখিল হতে লাগলো ইসলামের শিবিরে। মক্কার কুরাইশদের অনেকের মধ্যেও এলো বিরাট পরিবর্তন। সত্য উপলব্ধি করলো তারাও। একে একে আসতে লাগলো আলোর মিছিলে। এলেন বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও আমব ইবনে আস। ইসলাম গ্রহণের পর মর্যাদা আরো বেড়ে গেলো তাঁদের। দু'জনই পেলেন দিগ্বিজয়ী সেনাপতির পদ।

কিন্তু ইসলামের এই অগ্রগতি চক্ষুশূল হলো খায়বারের ইহূদীদের। মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবার ঐক্যবদ্ধ হলো তারা। প্রস্তুতি নিলো মদীনা আক্রমণের। তাদের সাথে যোগ দিলো মদীনা থেকে বিতাড়িত বনু নাজির ও বনু কাইনুকার ইহূদীরাও।

মদীনা হতে প্রায় দু'শ মাইল দূরে খায়বার ভূ-খণ্ডের অবস্থান। সবুজ শ্যামলিমায় ঘেরা এই জনপদের মাটিও ছিলো খুব উর্বর। প্রচুর ফসল ফলতো এখানে। খাদ্য ও পানীয় জলও ছিলো সহজলভ্য। এই সমৃদ্ধ জনপদে দীর্ঘদিন ধরে বাস করে আসছিলো ইহূদীরা। এখানে বসে ইসলামকে ধ্বংস করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিলো তারা। তাদের একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও ছিলো। আর তা হলো, মদীনা দখল করে একে ইহূদী রাষ্ট্রে পরিণত করা। এ উদ্দেশ্যে নিজেদের অবস্থানও সুদৃঢ় করেছিলো তারা। নির্মাণ করেছিলো কয়েকটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। এগুলোর মধ্যে কামুস দুর্গই ছিলো সবচে' সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য।

আসির নামক এক লোক তখন ইহূদীদের নেতা। ইসলামের বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার ও দুর্বিনীতি এই পাপিষ্ঠ প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো ঃ

'এতোদিন আমরা মুহাম্মদ সম্বন্ধে যে নীতি মেনে চলেছি, আজ হতে তা ত্যাগ করলাম। মদীনা আক্রমণই হবে এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।'

ইহূদীদের এই চক্রান্তের সংবাদ সময় মতো পৌঁছে গেলো নবীর কাছে। তিনিও বসে রইলেন না। চৌদ্দশ' পদাতিক ও দু'শ' ঘোড় সওয়ার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন খায়বার অভিমুখে। নবীজী এতো দ্রুত ও সঙ্গোপনে সৈন্য চালনা করলেন যে, ইহূদীরা কোনো পূর্বাভাষই পেলো না।

সেদিন সকাল বেলা। সূর্য উঠেছে খায়বারের পুব আকাশে। ইহূদীরাও মাঠে

এসেছে যথারীতি। মনের আনন্দে কাজ করছে সবাই। হঠাৎ দেখতে পেলো সামনে বিরাট মুসলিম বাহিনী। ভয়ে আতকে উঠলো তারা। দৌড়ে গিয়ে সংবাদ দিলো নগরবাসীদের।

হতভম্ব হয়ে গেলো ইহূদীরা। তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে, মুসলমানরা এমনিভাবে আক্রমণ করে বসবে তাদের আবাসভূমি। তাই দিশেহারা হয়ে পড়লো তারা। প্রতি আক্রমণের সাহস পেলো না। নিরুপায় হয়ে দুর্গে আশ্রয় নিলো।

দুর্গ আক্রমণ করলো মুসলিম বাহিনী। প্রথমে নায়েন দুর্গ। অল্প সময়ের মধ্যে হস্তগত হলো তা। তারপর বিজিত হলো আরো কয়েকটি ছোট ছোট কেল্লা। কিন্তু খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো কামুস কেল্লা অধিকারের বেলায়। এ দুর্গ ছিলো খুবই সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য। কেনানা নামক দলপতির নেতৃত্বে ইহূদীরা এই দুর্গে এসে আশ্রয় নিলো। মুসলিম বাহিনী দুর্গ অবরোধ করলো। কিন্তু প্রবল বাধার সম্মুখীন হলো তারা। কয়েক দিন কেটে গেলো। তবু দুর্গের পতন হলো না। আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চলতে লাগলো।

নবীজী এক এক দিন এক এক জনের ওপর সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন। প্রথম দিন হযরত আবু বকর (রা.), দ্বিতীয় দিন হযরত ওমর (রা.) সৈন্য চালনা করলেন। কিন্তু দুর্গের পতন ঘটানো সম্ভব হলো না। তৃতীয় দিন রাসূল (সা.) হযরত আলীর (রা.) হাতে তরবারি দিয়ে দোয়া করলেন।

হযরত আলী (রা.) কেল্লার কাছে পৌঁছতেই ইহূদী বীর মারহাব শিরস্ত্রাণ পরে বাইরে এলো। মল্ল যুদ্ধের আহ্বান জানালো আলীকে। শুরু হয়ে গেলো আলী ও মারহাবের মধ্যে ভীষণ মল্ল যুদ্ধ। আলী তরবারি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন মারহাবের মাথায়। সে আঘাতে তার মাথা দু'ভাগ হয়ে একেবারে দাঁত পর্যন্ত পৌঁছে গেলো তরবারি। সাথে সাথে মাটিতে পড়ে গেলো মারহাব। অল্পক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হলো তার।

মারহাবের মৃত্যুর পর তার ভাই ইয়াসীর দুর্গের বাইরে এলো। চিৎকার করে আবার যুদ্ধের আহ্বান জানালো সে। তার ডাকে সাড়া দিলেন যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.)। তিনি তরবারি হাতে সামনে এসে দাঁড়ালেন ইয়াসিরের। মুহূর্তের মধ্যে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন তাকে। এরপর আর

যুদ্ধ করতে সাহস পেলো না ইহুদীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করলো তারা। পতন ঘটলো দুর্ভেদ্য দুর্গ কামুসের।

ইহুদীরা সেই প্রথম থেকেই বিরোধিতা করে আসছে ইসলামের। চালিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা ধ্বংসাত্মক কাজ। বারবার তারা চেয়েছে যুদ্ধ করে ইসলামকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলতে, এমনকি আল্লাহর রাসূলকে (সা.) হত্যার চক্রান্ত করতেও দিল কাঁপেনি তাদের। জঘন্য অপরাধী তারা। অমার্জনীয় তাদের অপরাধ। তবু দয়ার সাগর বিশ্বনবী (সা.) বারবার ক্ষমা করেছেন তাদেরকে। এবারও কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে তিনি সন্ধি করলেন ইহুদীদের সাথে।

তবুও তৃপ্ত হলো না ইহুদীদের পাপিষ্ঠ মন। আবারও গোপনে রাসূলকে হত্যা করার সংকল্প করলো তারা। এ পাপ-বাসনা পূর্ণ করার দায়িত্ব নিলো ইহুদী রমণী জয়নব। নবীকে দাওয়াত করলো সে। নবীজী কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীকে সাথে নিয়ে গেলেন তার বাড়িতে। জয়নব সুন্দর করে গোশত রেধে বিষ মিশালো তাতে। তারপর সে গোশত খেতে দিলো নবী ও তাঁর সঙ্গীদের। রাসূলে খোদা (সা.) 'বিসমিল্লাহ' বলে এক টুকরো মুখে দিয়েই চিৎকার করে উঠলেন ঃ

'সাবধান, এ গোশত তোমরা কেউ খেওনা। এতে বিষ মিশানো আছে।'

কিন্তু বিশর নামক এক সাহাবী আগেই গিলে ফেলে ছিলেন এক টুকরো। তাই সাথে সাথে বিষক্রিয়া শুরু হলো তাঁর। অল্পক্ষণের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি। কিন্তু আল্লাহর রহমতে কোনো ক্ষতি হলো না রাসূলের (সা.)।

এ ঘটনার পর নবীজী ডেকে পাঠালেন জয়নবকে। নবীর সামনে হাজির হলো সে। স্বীকার করলো নিজের দোষ। হযরতের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো বার বার। হযরত ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা করলেন জয়নবকে। কিন্তু ইচ্ছে করে বিশরের মৃত্যু ঘটানোর অপরাধে প্রাণদণ্ড দিলেন তাকে।

সময় বড় গতিশীল। প্রবাহমান সমুদ্রের স্রোতের মতো অবিরাম বয়ে চলে সে। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস এমনি করে দ্রুত পূর্ণ হয় বছর। হুদায়বিযার সন্ধির পর দেখতে দেখতে কেটে গেলো একটি বছর।

আবার আকাশ কোণে উঠলো জিলকদের চাঁদ। আকাশের ওই বাঁকা চাঁদ স্মরণ করিয়ে দিলো মুলতবি হজ্জ পালনের কথা। নবীজী তাঁর অনুসারীদের নিয়ে পবিত্র কাবা যিয়ারতের জন্যে তৈরি হলেন।

নির্দিষ্ট দিনে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন তিনি। সঙ্গে চললো দু'হাজার ভক্ত মুসলমান। কুরবানির জন্যে সাথে নেয়া হলো ষাটটি উট। যুল হুলায়ফা নামক স্থানে এসে পৌঁছালেন নবী। সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে আবার মক্কার পথ ধরলেন।

নবী (সা.) চলেছেন সবার আগে। উটের পিঠে। পেছনে পেছনে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন দু'হাজার হজ্জ যাত্রী। চলতে চলতে এক সময় পৌঁছে গেলেন সবাই। দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হলো পবিত্র কাবা। সাথে সাথে নবীজী প্রাণের আবেগ ঢেলে উচ্চারণ করলেন– 'লাব্বায়েক, লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক'। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাজার ভক্ত মুসলমানের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো সেই একই কথা– লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক'। প্রভু হে, আমরা হাজির।

আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা (রা.)। এই তো পবিত্র কা'বা। এই তো তাঁদের জন্মভূমি। এখানেই তো ছিলো তাদের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন– সবকিছুই। এ জন্মভূমির সাথে তাই তাঁদের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। এর সবকিছুই তাঁদের কাছে অতি প্রিয়। এখানকার আকাশ-বাতাস, গাছ গাছালী ঊষর মরু প্রান্তর, শান্ত উপত্যকা, বিশাল পর্বত– সব ছেড়ে দূরে থাকতে হয়েছে সাতটি বছর। মহানবীর (সা.) আজ মনে পড়ছে অতীতের কত শত কথা। তাঁর বুকের নিভৃত কোণে বারে বারে দোলা দিচ্ছে বিবি খাদিজা, দাদা আব্দুল মুত্তালিব, আবু তালিবের স্মৃতি।

এদিকে কুরাইশরা মুসলমানদের এই আগমনের দৃশ্য দেখে কী করবে তা বুঝে উঠতে পারলো না। এতোদিন যে মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের ওপর তারা নির্মম নির্যাতন চালিয়ে এসেছে, তারাই আজ মাথা উঁচু করে মক্কায় প্রবেশ করেছে। আজ তাঁদের বাধা দেয়ার শক্তি নেই তাদের। লজ্জা! অসহনীয় লজ্জা! এই লজ্জা নিয়ে তারা কিভাবে দাঁড়িয়ে দেখবে মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের আগমন। না, তারা তা পারবে না। এসব ভেবে তারা সবকিছু ফেলে চলে গেলো। আশ্রয় নিলো নিকটবর্তী পাহাড়ে গিয়ে।

নবী (সা.) তাঁর সাহাবাদের নিয়ে হজ্জ করলেন। সাফা মারওয়া প্রদক্ষিণ করলেন সাত বার। তারপর উটগুলোকে কুরবানি করলেন সেখানে। দেখতে দেখতে তিন দিন কেটে গেলো। ফুরিয়ে এলো মক্কায় অবস্থানের মেয়াদ। মহানবী (সা.) তাঁর সাথীদের নিয়ে মক্কা ত্যাগ করলেন।

## এগারো

হারেস ইবনে উমায়ের (রা.)। সিরিয়ার পথে চলেছেন রাসূলের (সা.) দূত হয়ে। ইসলামের দাওয়াত দিতে। বসরায় পৌছলেন তিনি। সেখানকার শাসক শোরাহবীলকে নবীর নির্দেশে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। শোরাহবীলের কানে ইসলামের খবর আগেই পৌছেছিলো, আর তখন থেকেই সে ছিলো ইসলাম বিদ্বেষী। তাই রাসূলের সাহাবার আমন্ত্রণ তার কাছে অপ্রিয় হয়ে গেলো। রোষে, রাগে, ঈর্ষায় জ্বলে উঠলো সে। ধিককার জানালো সাহাবাকে, এমনকি হত্যা করে বসে তাঁকে। যা সব আন্তর্জাতিক নিয়মের বরখেলাপ, অনিয়ম, অবিধিসম্মত। এ মর্মান্তিক সংবাদ পৌছালো মদীনায়। নবীর চিত্ত ব্যাকুল হলো, রক্তক্ষরণ হলো হৃদয়ে। প্রিয় অনুচরের অসহায় মৃত্যুতে তিনি নতুন যুদ্ধ-পরিকল্পনা হাতে নিলেন। যুদ্ধের সাজে আবারও সজ্জিত করলেন যোদ্ধা সাহাবীদের। শোরাহবীল ও তার রাজা হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে পাঠালেন মাত্র তিন হাজার সাহাবার এক সজ্জিত বাহিনী। অপ্রতুল তাঁদের যুদ্ধ সজ্জা, কিন্তু দৃঢ় ও লড়াকু তাঁদের মনবল, শক্তিতে তাঁরা অমিত তেজি, মহাপ্রভুর প্রতি বিশ্বাস ও বোধে অটুট, হিমাচলের মতো। ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধের নাম মূতার যুদ্ধ।

হিজরী অষ্টম শতাব্দী। জমাদিউল আওয়াল মাস। যুদ্ধের সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। এবার সেনাপতি নিযুক্তির পালা। ইতোপূর্বে প্রত্যেক সামরিক অভিযানে সেনাপতি থাকতো যথারীতি একজন। কিন্তু এবার নবীজী (সা.) এ রীতির ব্যতিক্রম ঘটালেন। সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন পর পর তিনজনকে। যায়েদ বিন হারেসা, জাফর বিন আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা– এই তিনজনের পরপর নাম ঘোষণা করলেন তিনি। তারপর বললেন ঃ

'যদি যায়েদের পতন হয়, তবে জাফর এবং যদি জাফরের পতন হয়, তবে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে। যদি পরপর তিনজনই শহীদ হয়, তবে মুসলমানরা নিজেদের মধ্য হতে তাদের সেনাপতি নির্বাচন করে নেবে।'

সামরিক বাহিনী রওনা হলো। নবীজী নিজেও চললেন এই বাহিনীর সাথে। বিদা পর্বত পর্যন্ত গিয়ে থামলেন তিনি। সেখানে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে দিলেন এক উপদেশমণ্ডিত বক্তৃতা ঃ

'কেউ নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও সাধারণ মানুষকে হত্যা করবে না, কোনো ফসল নষ্ট করবে না, কোনো ঘর-বাড়ি জ্বালাবে না, শুধু আল্লাহর শত্রুকে বধ করবে এবং সব সময় আল্লাহকে ভয় করবে।'

বক্তৃতা শেষ করলেন নবী (সা.)। তারপর সেনাবাহিনীকে সেখান থেকে বিদায় দিয়ে ফিরে এলেন মদীনায়।

সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে চললেন যায়েদ। সিরিয়ার মায়ান অঞ্চলে পৌছলেন তিনি। জানতে পারলেন, মায়ারে এক লক্ষ সুসজ্জিত রোমান সৈন্য তৈরি হয়ে আছে। আর সে সেনাবাহিনী পরিচালনা করছেন সম্রাট হিরাক্লিয়াস নিজেই।

এ সংবাদ শুনে একটু দমে গেলো মুসলিম বাহিনী। দু'দিন তারা অবস্থান করলো মায়ানে। চিন্তা-ভাবনা করলেন তাদের করণীয় সম্পর্কে। কেউ কেউ বললেন, 'রাসূলের (সা.) কাছে পত্র পাঠিয়ে জানানো উচিত। তিনি হয় আরো সৈন্য পাঠিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন, না হয় যা ভালো মনে করেন নির্দেশ দেবেন।

কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা বিরোধিতা করলেন এ মতের। তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন ঃ

'হে মুসলিমগণ! আজ তোমার যা অপছন্দ করছো, সেটাই তোমরা কামনা করেছিলে। আর তা হলো শাহাদাত। আমরা সংখ্যাধিক্যের জোরে লড়াই করি না। যে জীবন ব্যবস্থার দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন তার জন্য আমরা লড়াই করি। অতএব এগিয়ে চলো, বিজয় বা শাহাদাত এ

দুটো উত্তম জিনিসের যে কোনো একটা অবশ্যই আমাদের জন্য নির্ধারিত আছে।'

'আল্লাহর শপথ, ইবনে রাওয়াহা হক কথাই বলেছেন।' বললেন সবাই।

তারপর এগিয়ে চললেন মুসলিমরা। বালকা সীমান্তের কাছে পৌঁছাতেই হিরাক্লিয়াসের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হলেন তাঁরা। বালকার সে জায়গার নাম মাশরিফ। এখান থেকে একদিকে সরে গেলেন মুসলিমরা। অবস্থান নিলেন মূতা নামক একটি গ্রামে। এখান থেকে রণ-প্রস্তুতি নিলেন তারা। সেনাবাহিনীর ডান দিকে বনু উযরার কুতবা ইবনে কাতাদাকে (রা.) আর বাম দিকে আনসারী উবায়া ইবনে মালিককে (রা.) দায়িত্ব দেয়া হলো। তমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। প্রধান সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারেসার হাতেই ইসলামের পতাকা। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সৈন্য চালনা করতে লাগলেন তিনি। অনেকক্ষণ প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন, তাঁর হাতে নিহত হলো অনেক রোমান সৈন্য; কিন্তু শেষ পর্যন্ত শহীদ হলেন তিনি।

যায়েদের পতনের পর কলেমার পতাকা হাতে নিলেন জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.)। বীরত্বের সাথে লড়তে লাগলেন তিনিও। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে শত্রু বেষ্টিত হয়ে পড়লেন তিনি। দুশমনরা প্রথমে তরবারির আঘাত হানলো তাঁর ডান হাতে এবং তা কেটে পড়ে গেলো। তখন তিনি বাম হাতে ধরে রাখলেন পতাকা। কিছুক্ষণ পর বাম হাতও কেটে গেলো। তখন তিনি দুই ডানা দিয়ে চেপে ধরলেন পতাকা। এর খানিক পরে শত্রুর তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে শহীদ হলেন তিনি।

এবার সেনাপতির দায়িত্ব পড়লো আব্দুল্লাহ্ বিন রাওওয়াহার ওপর। তখন তাঁর হাতে ছিলো একখণ্ড গোশত। সেই গোশতের টুকরোর কিছুটা কেবল দাঁতে ছিড়েছেন তিনি। এমনি সময় আওয়ায উঠলো ঃ

'জাফর শহীদ হয়েছেন।'

সাথে সাথে গোশতের টুকরোটা ছুড়ে ফেললেন তিনি। তরবারি হাতে এগিয়ে গেলেন। যুদ্ধ করতে লাগলেন প্রচণ্ড বেগে। কিছুক্ষণ কেটে গেলো। শহীদ হয়ে গেলেন আব্দুল্লাহ্ও। অকস্মাৎ আওয়ায উঠলো ঃ এক্ষুণি সেনাপতি নির্বাচন করতে হবে।'

তাঁবুতে ফিরে গেলেন সবাই। আলোচনায় বসলেন সাথে সাথে। সেনাপতি নিযুক্তির কাজ শেষ করলেন তাড়াতাড়ি। নও মুসলিম খালিদ বিন ওয়ালীদের উপরই পড়লো সেই মহান দায়িত্ব।

পতাকা হাতে নিলেন খালিদ। লড়তে লাগলেন বীর বিক্রমে। তাঁর হাতেই ভাঙ্গলো পরপর আটখানা তরবারি। নিহত হলো অনেক রোমান সৈন্য। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। তখন যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলো উভয় পক্ষ।

এদিকে মদীনা হতে একদল নতুন সৈন্য পাঠালেন মহানবী (সা.)। সে সেনাদল দ্রুত পৌঁছে গেলো মূতায়। যোগ দিলো খালিদের বাহিনীর সাথে।

পরের দিন। সূর্য উদয়ের সাথে সাথে আবার তৈরি হলো মুসলিম বাহিনী। রণ কুশলী খালিদ পাতলা পাতলা লাইন করে সারা ময়দানে ছড়িয়ে দিলেন সৈন্যদের। শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্যে এ ব্যবস্থা করলেন তিনি। বাস্তবে হলোও তাই। নতুন সৈন্য আগমনের খবর রোমানরা আগেই শুনেছিলো। এখন তারা ভাবলো, সে সৈন্যের পরিমাণ বেশুমার। মুসলমানদের সাথে গতকালের যুদ্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে রোমানদের। একেবার কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলো তারা। তারপর এই নতুন সৈন্য যোগদানের খবরে দারুণ ভয়ও হতাশা দেখা দিলো তাদের মধ্যে। রণে ভঙ্গ দিলো তারা। অল্পক্ষণের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেলো ময়দান।

তখন খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে ফিরে চললেন মদীনায়। এদিকে মহানবী (সা.) ও সাধারণ মুসলমানরা এগিয়ে আসছিলেন যুদ্ধ-ফেরত সাহাবীদের অভ্যর্থনা জানাতে। তাঁদের সাথে শিশু ও বালক-বালিকারাও ছিলো। মুজাহিদ বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী হলে সবাই অভিনন্দন জানালেন তাঁদেরকে।

জাফর, যায়েদ ও আব্দুল্লাহকে হারানোর ব্যথায় ব্যথাতুর হলো নবীর (সা.) হৃদয়। তিনি শোক প্রকাশ করলেন তাঁদের জন্যে। তারপর গেলেন শহীদদের বাড়ি বাড়ি। তাঁদের পরিবার-পরিজনদের সান্ত্বনা দিলেন। শিশুদের আদর করলেন কোলে নিয়ে।

# বারো

হুদাইবিয়ার সন্ধির কয়েকটি শর্তের মধ্যে একটি ছিলো ঃ আরবের যে কোনো গোত্র মুহাম্মদ (সা.) অথবা কুরাইশদের সাথে মিত্রতা করতে পারবে। এ ব্যাপারে কোনো পক্ষই বাধা দেবে না। এই শর্তানুযায়ী মক্কার বনু খোজা গোত্র মহানবীর (সা.) সাথে আর বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মিত্রতা গড়ে তোলে।

খোজা গোত্রের বাস ছিলো কুরাইশদের একেবার কাছাকাছি। মক্কার উপকণ্ঠে। ওয়াতির পল্লীতে। সেই কাছের প্রতিবেশীরাই বন্ধুত্ব করলো দূর মদীনার মুসলমানদের সাথে। কুরাইশদের শত্রু মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের সাথে। এটা সহ্য হলো না কুরাইশদের। হবার কথাও নয়। কেননা, শত্রুর বন্ধুও সব সময়ই শত্রু, চক্ষুশূল। এ ক্ষেত্রেও এ রীতির ব্যতিক্রম হলো না। কুরাইশদের কোপানলে পড়লো খোজা গোত্র। মুসলমানদের বন্ধু হয়ে কুরাইশদের শত্রু হলো তারাও।

আক্রোশ। আঘাত। আত্মপ্রসাদ। এই ছিলো সমকালীন কুরাইশদের শত্রু ভাবনা। এবার তাদের এ ভাবনা আবর্তিত হলো খোজা গোত্রকে ঘিরে। কুরাইশরা তাদের শায়েস্তা করতে চায়। বুঝিয়ে দিতে চায়, মক্কায় বাস করে মদীনার মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব করার পরিণতি কী। কিন্তু সে সময় কুরাইশদের পক্ষে খোজা গোত্রকে আঘাত করাটা ছিলো অনিয়ম, অবিধিসম্মত। কেননা, হুদাইবিয়ার সন্ধি পত্রে দশ বছরের জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধের শর্ত আরোপিত হয়েছে। এই কারণে খোজা গোত্রের ওপর সরাসরি হামলা করতে পারে না কুরাইশরা। খোজাদের শায়েস্তা করতে তাদের যেতে হয় অন্য পথে। খোজাদের পূর্ব শত্রু বনু বকর গোত্রের সাথে যোগ দিলো তারা। তারপর একদিন গভীর রাতে বনু বকর গোত্রকে সামনে রেখে খোজাদের ওপর হামলা করলো তারা। ভেঙ্গে গেলো হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি। ঘটনাটি আরো পরিষ্কার করে বলা যায় এভাবে ঃ

বনু হাদরামী গোত্রের মালিক ছিলো ইবনে আব্বাদ। একদিন ব্যবসা উপলক্ষে খোজা গোত্রের বসতির ওপর দিয়ে যাচ্ছিল সে। এ সময় খোজা

গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করলো, ছিনিয়ে নিলো তার কাছের সবকিছু। এর ফলে বনু বকর গোত্র খোজাদের ওপর আক্রমণ চালায়। হত্যা করে তাদের একজনকে। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে খোজা গোত্র বনু বকরের একাংশ বনু দায়েলের সরদার আসওয়াদের তিন সন্তানকে হারাম শরিফের কাছে হত্যা করে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড নিয়ে বনু বকর ও বনু খোজার মধ্যে বিরাজ করছিলো চরম উত্তেজনা। এমনি সময় হলো ইসলামের অভ্যুদয়।

সবার দৃষ্টি গেলো সেদিকে। ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান নিলো অবিশ্বাসীরা সব। তাদের সাথে বনু বকর ও খোজা গোত্রও। শুরু হলো হক ও বাতিলের সংঘাত, সংঘর্ষ। উত্তপ্ত হয়ে উঠলো পরিবেশ। অবশেষে হলো হুদাইবিয়ার সন্ধি। তখন শান্ত হলো পরিবেশ। আর তখনই কুরাইশদের জিঘাংসা নেমে এলো খোজা গোত্রের ওপর। তারা যোগ দিলো বনু বকরের সাথে। রক্তের বদলা নিতে উত্তেজিত করে তুললো তাদেরকে এবং নিজেরাও সাহায্যের আশ্বাস দিলো তাদের।

একদিন গভীর রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার সে রাত। চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। ওয়াতির এর নিভৃত পল্লীতে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে ঘুমিয়ে আছে খোজা সম্প্রদায়।

এমন সময় কুরাইশ ও বনু বকর গোত্রের লোকেরা আকস্মিক হামলা চালালো তাদের ওপর। নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো নারী-পুরুষ ও শিশুদের। অনেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলো। আশ্রয় নিলো কা'বা শরিফের ভেতর। যেখানে রক্তপাত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু সেখানে গিয়েও বাঁচতে পারলো না খোজারা। কুরাইশ ও বনু বকর গোত্রের লোকেরা কা'বা শরিফে ঢুকেও নির্বিচারে হত্যা করলো তাদের। খোজাদের রক্তে রঞ্জিত হলো পবিত্র কাবার অভ্যন্তর। এভাবে কুরাইশরা ভঙ্গ করলো হুদাইবিয়ার সন্ধি।

এই নৃসংশ হত্যাকাণ্ডের পর খোজা গোত্রের বিশেষ প্রতিনিধি আমর ইবনে সালেম খুজায়ী চলে গেলো মদীনায়। মহানবীর (সা.) কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা করলো সে। সে বললো ঃ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আপনি আমাদের সাহায্য করুন। আল্লাহ সর্বদা আপনাকে পথ প্রদর্শন করবেন।'

নবীজী (সা.) দেখলেন, রাজনীতি ও ধর্মনীতি উভয় দিক দিয়েই তিনি খোজাদের সাহায্য করতে বাধ্য। কেননা মুসলমানদের মিত্র তারা এবং তাদের সাহায্যের জন্যেও চুক্তিবদ্ধ তিনি। আজ বিপদগ্রস্ত খোজাদের সাহায্য না করলে সন্ধি চুক্তিকে অবমূল্যায়ন করা হবে। তাই রাসূল (সা.) তাদেরকে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। অনিবার্য হয়ে উঠলো মক্কা অভিযান। কিন্তু তিনি সরাসরি কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান না পাঠিয়ে আগে দূত পাঠালেন। প্রস্তাব দিলেন তিনটি। এর মধ্যে যে কোনো একটি মেনে নিতে বললেন তাদের।

প্রস্তাব তিনটি হলো ঃ

১. হয় তোমরা খোজা গোত্রকে অর্থ দিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিকার করো।

২. না হয়, বনু বকর গোত্রের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করো।

৩. না হয়, হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল বলে ঘোষণা করো।

কুরাইশদের মনে আগে থেকেই বিষ জ্বালা শুরু হয়েছিলো। সন্ধি বাতিলের পক্ষেই মত দিলো তারা। তাদের মধ্যে থেকে কোরতা বিন ওমর বললো ঃ

'আমরা শেষের শর্তটি মেনে নিলাম।'

দূত ফিরে এলো মদীনায়। নবীকে (সা.) জানালো সব কথা। নবীজী বুঝলেন, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

নবী (সা.) আর সময় নষ্ট করলেন না। মক্কা বিজয়ের জন্যে তৈরি হতে লাগলেন তিনি। খুব গোপনেই চলতে লাগলো সকল প্রস্তুতি।

প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলো। অষ্টম হিজরির রমযানের দশ তারিখ। বুধবার। দশ হাজার সহচর নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন মহানবী (সা.)। মক্কার নিকটবর্তী মাররুয যাহরানে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন তিনি। হযরত মূসার (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী আজ পূর্ণ হলো ঃ

'দশ হাজার ন্যায়নিষ্ঠ সহচরসহ তিনি (মুহাম্মদ সা.) মক্কায় আসবেন।'

দিন পার হলো। সন্ধ্যা এলো। দশ হাজার সৈন্যের খাদ্য প্রস্তুতের প্রয়োজন হলো। নবীজী আদেশ দিলেন বেশি করে চুলা খুড়তে। তাই করা হলো।

তারপর শুরু হলো রান্নার কাজ। বিপুল সংখ্যক চুলার আগুনে আলোকিত হয়ে উঠলো সেই গিরি উপত্যকা। এ যেন আলোর সাগর।

মক্কা থেকে কুরাইশরাও দেখতে পেলো এ আলোর ঝলকানি। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো সবাই। তারা ভাবলো, 'চুলা যদি এতো বেশি হয়, তবে সৈন্য সংখ্যা না জানি কত!' ভীষণ ভীত হয়ে পড়লো কুরাইশরা। হতভম্ব হয়ে গেলো কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান। কী করবে, কিছুই বুঝতে পারলো না সে। মদীনাবাসী সত্যিই তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসছে কিনা, তাদের সৈন্য সংখ্যাই বা কত– এসব জানার বড় কৌতূহল হলো তার। দু'জন সঙ্গী– হাকিম ইবনে নিজাম ও বুদায়েলকে সাথে নিয়ে গোয়েন্দাগিরিতে বের হলো সে।

চলেছে আবু সুফিয়ান। ঘুটঘুটে অন্ধকারের বুক চিরে। হঠাৎ শুনতে পেলো একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর ঃ 'দাঁড়াও। এখন তোমরা আমাদের হাতে বন্দী।'

চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালো সে। তখন তার কানে এলো আর একটি আওয়ায ঃ

'চলো, আবু সুফিয়ান। আজ উপযুক্ত শিক্ষা দেবো তোমাকে।'

হযরত ওমর (রা.) কয়েকজন রক্ষীসহ ছদ্মবেশে বের হয়েছিলেন। তাঁদের হাতেই গ্রেফতার হলো আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদ্বয়।

ওমর (রা.) তাকে নিয়ে হাজির করলেন মহানবীর (সা.) সামনে। তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্যে রাসূলের অনুমতি চাইলেন তিনি।

নবীজীর প্রাণের শত্রু– ইসলামের শত্রু– আল্লাহর শত্রু এই আবু সুফিয়ান। দীর্ঘ একুশটি বছর ধরে সে ইসলাম ও তার নবীর বিরুদ্ধে কত ষড়যন্ত্রই না করেছে। নিষ্ঠুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলো নিরীহ মুসলমানদের। আল্লাহর নবীকেও হত্যা করতে চেয়েছিলো, বার বার। সেই চরম শত্রু আজ নবীজীর হাতের মুঠোয়। ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে তিনি তার গর্দান উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু নবীজী তা করলেন না। ক্ষমা করে দিলেন দীর্ঘ দিনের দুশমন আবু সুফিয়ানকে। তারপর কোমল কণ্ঠে বললেন ঃ

'হে আবু সুফিয়ান, ধিক তোমাকে! আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই– একথা মেনে নেয়ার সময় কি তোমার এখনো হয়নি?'

'আমার ধারণা, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ যদি থাকতো, তাহলে এতোদিনে আমাকে সাহায্য করতো।'

'ধিক তোমাকে! আমি যে আল্লাহর রাসূল, তা কি এখনো উপলব্ধি করনি?' আবার জিজ্ঞেস করলেন নবীজী।

'আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক। আপনি এতো উদার, সহনশীল ও আত্মীয় সমাদরকারী যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না। তবে আপনার রাসূল হওয়া সম্পর্কে আমার মনের মধ্যে এখনো কিছু দ্বিধা-সংশয় রয়েছে।' বললো আবু সুফিয়ান।

মহানবীর (সা.) চাচা হযরত আব্বাস (রা.) ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ কথার জন্যে তিনি ভর্ৎসনা করলেন আবু সুফিয়ানকে। বললেন ঃ

'ধিক তোমাকে! ইসলাম গ্রহণ করো এবং সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রাসূল। নচেৎ এক্ষুণি তোমার গর্দান কাটা যাবে।'

তখনো আবু সুফিয়ানের সংশয় পুরোপুরি দূর হয়নি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে দোল খেতে খেতে সে উচ্চারণ করলো ঃ

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ।'

আবু সুফিয়ান কুফরী জীবন ত্যাগ করলো। আশ্রয় নিলো ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। তখন আব্বাস (রা.) নবীকে (সা.) বললেন ঃ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু সুফিয়ান একটু মর্যাদা লোভী। কাজেই তাকে গৌরবজনক একটা কিছু দিন।'

'বেশ, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। যে ব্যক্তি নিজের বাড়ির দরজা বন্ধ করে রাখবে সেও নিরাপত্তা লাভ করবে। যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, তাকেও কিছু বলা হবে না।' ঘোষণা দিলেন নবীজী।

আবু সুফিয়ান আর দেরী করলেন না। ফিরে এলেন মক্কায়। কুরাইশদের সম্বোধন করে বললেন ঃ

'হে কুরাইশরা! শোন, মুহাম্মদ (সা.) এমন এক বাহিনী নিয়ে আসছেন যার

মোকাবিলা করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এখন আবু সুফিয়ানের বাড়িতে যে আশ্রয় নেবে তার ভয় নেই। আর জেনে রাখো, আমি এখন আর তোমাদের দলপতি নই। আমি এখন মুসলমান।'

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে ছুটে এলো আবু সুফিয়ানের কাছে। তাঁর গোফ টেনে ধরে বললো ঃ

'হে কুরাইশরা, এই মোটা পেটুকটাকে হত্যা করো। জাতির নেতৃত্বের মর্যাদায় থেকে সে কলঙ্কিত হয়েছে।'

'তোমাদের বিপর্যয়ের বিষয়ে সাবধান হও। এই মহিলার কথায় কান দিও না। সত্যিই তোমাদের ওপর এক অপ্রতিরোধ্য বাহিনী সমাগত। এখন আমার বাড়িতে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে।' উচ্চস্বরে বললেন আবু সুফিয়ান।

তখন কুরাইশরা সবাই নিজ নিজ আশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কেউ আবু সুফিয়ানের বাড়িতে ছুটলো, কেউ গেলো কা'বা শরিফের দিকে। আবার কেউবা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রইলো।

পরের দিন। ভোর বেলা। মক্কায় প্রবেশের ব্যবস্থা করলেন মহানবী (সা.)।

মক্কায় প্রবেশের দু'টো রাস্তা, একটি 'কাদা', অন্যটি 'কুদা'। 'কাদা' নামক পাহাড়ের দিকের পথটি উঁচু আর কুদা' পাহাড়ের পথটি নিচু। এদিকেই পবিত্র কাবা শরিফ অবস্থিত।

নবীজী (সা.) উভয় পথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশের ব্যবস্থা করলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনীকে 'কুদা' পাহাড়ের দিক দিয়ে নগরীতে প্রবেশের নির্দেশ দিলেন। আরেক সেনাবাহিনী নিয়ে নিজে 'কাদা' পাহাড়ের পথ দিয়ে নগরীতে প্রবেশের জন্যে এগিয়ে চললেন।

মহানবী (সা.) চেয়েছিলেন রক্তপাতহীন বিজয়। তাই তিনি আজ কাউকে আক্রমণ করতে নিষেধ করলেন। খালিদ (রা.) কে নির্দেশ দিলেন ঃ

'যদি কুরাইশরা তোমাদের সম্মুখীন হয়, তবে তোমরা তাদের হত্যা করবে এবং সাফা পাহাড়ে এসে আমার সাথে দেখা করবে। তাছাড়া কাউকে আঘাত করবে না।'

রাসূলের (সা.) সঙ্গী সেনারা সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছেন। জনশূন্য পথ। একটি মানুষও নেই রাস্তায়। আবু সুফিয়ানের ঘোষণা অনুযায়ী যে যেখানে পেরেছে, আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। সামনে কেউ নেই। নেই কারোর বাধা দেয়ার ক্ষমতাও। কুরাইশদের সমস্ত গর্ব, অহঙ্কার আজ মরুর ধূলায় মিশে গেছে।

শহরে প্রবেশ করলেন মহানবী (সা.)। 'হাজুন' নামক স্থানে বিজয় পতাকা স্থাপন করলেন এবং সেখানেই শিবির স্থাপন করলেন।

ওদিকে এগিয়ে আসছে খালিদের (রা.) বাহিনী। দ্বিতীয় পথ দিয়ে। সামান্য বাধার সম্মুখীন হলেন তিনি। আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা, উমাইয়ার পুত্র সফওয়ান এবং আমরের পুত্র সুহায়ল প্রমুখরা কিছু সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করলো খালিদের বাহিনীকে। দু'জন মুসলমানকে হত্যাও করলো তারা। বাধ্য হয়ে মোকাবিলা করতে হলো খালিদ (রা.) কে। বারো জন নিহত হলো তাতে।

তারপর খালিদ আর কোন বাধার সম্মুখীন হননি। নিরাপদে ফিরে এলেন রাসূলের (সা.) কাছে। রাসূল তাঁকে বারো জন কুরাইশ হত্যার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। খালিদ বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। সব শুনে নবীজী (সা.) বললেন, 'এটাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো।'

নবীজী সাহাবীদের নিয়ে কাবার দিকে এগিয়ে গেলেন। সাতবার পবিত্র কাবা তওয়াফ করলেন। বহু নর-নারী, শিশু, কিশোর তখন কাবার মধ্যে অবস্থান রত। দলবলসহ মহানবীকে (সা.) দেখে তারা ভীষণ ভীত হয়ে পড়লো। তারা চিন্তা করতে লাগলো ঃ

'মক্কায় আমরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর কত অত্যাচারই না করেছি। আজ আমাদের ওপর কী শাস্তি নেমে আসবে! হায়! হায়! আজ কী হবে আমাদের।'

কুরাইশদের মনে যখন এমনি আতঙ্ক বিরাজ করছিলো, ঠিক তখনই নবীজী (সা.) প্রবেশ করলেন কা'বার ভেতরে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে গেলো তাঁর অন্তর। তিনি উচ্চস্বরে উচ্চারণ করলেন, 'আল্লাহু আকবর'। সাথে সাথে হাজার হাজার সাহাবীর কণ্ঠেও ধ্বনিত হলো একই ধ্বনি–

'আল্লাহু আকবর', আল্লাহ মহান। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের বাণী বার বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো মক্কার আকাশ-বাতাসে। দীর্ঘ একুশ বছর পর।

কাবার ভেতরে তখনো স্তরে স্তরে সাজানো ছিলো তিনশ' ষাটটি মূর্তি। কুরাইশরা যাদের প্রভু বলে বিবেচনা করতো। নবীজী এবার ধীরে ধীরে মূর্তির দিকে এগিয়ে গেলেন। হাতের ছড়ি দিয়ে আঘাত করলেন মূর্তির অসাড় শরীরে। উচ্চারণ করলেন পাক কুরআনের সেই শাশ্বত বাণী ঃ

'আজ সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।'(সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৮১)

রাসূল (সা.) যখন যে মূর্তির গায়ে আঘাত করেন, তখনই সেটা উল্টে পড়ে যায়। এভাবে এক এক করে পড়ে গেলো তিনশ' ষাটটি মূর্তি। তারপর তিনি মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পালন করলেন সাহাবীরা। এভাবে আল্লাহর পবিত্র ঘর পাষাণ প্রতিমার অধিকারী মুক্ত হলো।

## তেরো

মক্কা বিজয়ের পর আগের অবস্থার পরিবর্তন এলো। পুরোপুরি পালটে গেলো অবিশ্বাসীদের চিন্তা, কর্ম ও উপলব্ধি। ধর্ম ও বিশ্বাসে তাদের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিলো যুগ যুগ ধরে, তাতে ফাটল ধরলো। অটল বিশ্বাস এলো নতুন ধর্ম ইসলাম ও নতুন আলোকিত মহামানব মুহাম্মদের (সা.) প্রতি। তাই তারা তাওহীদের আলোর পথে আসতে লাগলো, দলে দলে। তবে তখনো ইসলাম বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলো আরবের বেশ কয়েকটি গোত্র। যারা অবিশ্বাসী। এ তালিকায় নাম আগে আসে হাওয়াজিন ও সাকীফ গোত্রের। তারাই তীব্রভাবে রুখে দাঁড়ালো ইসলামের বিরুদ্ধে। নবী (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার স্বপ্ন তাদের চোখেও। এজন্যে তারা অস্ত্র তুলে নিলো হাতে।

তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি মালভূমির নাম হুনাইন। হাওয়াজিন ও সাকীফ গোত্রের বাস এখানে। ঘোর পৌত্তলিক তারা। পূজা করতো প্রসিদ্ধ

লাত দেবতার। আর্থিক স্বচ্ছলতা, আভিজাত্য, সংখ্যাধিক্য ও অমিত শক্তির দম্ভে এরা মদীনা আক্রমণ করতে চেয়েছিলো আরো আগে। পুরো এক বছর ধরে এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে সারা আরব ঘুরে বেড়ায়, অলি-গলি-রাজপথ, সবখানে। ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে বিভিন্ন গোত্রের মানুষদের আর স্বাক্ষর করে একটি চুক্তিপত্রে।

কিন্তু সে আশা আর পূরণ হয়নি তাদের। তার আগেই বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করলেন মহানবী (সা.)। এতে সবদিক দিয়ে ক্ষতি হলো তাদের। বিনষ্ট হলো তাদের আরাধ্য দেবতার মূর্তি, প্রসারিত হলো মক্কায় ইসলাম প্রসারের পথ। এই কারণে ভীষণ আঘাত তাদের অন্তরে। শুধু তাই নয়, নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তিত হয়ে পড়লো তারা। ভাবলো ঃ 'যেভাবে মুসলিমরা দিন দিন শক্তিমান হয়ে উঠছে, না জানি কবে তারা হুনাইনের দিকেই এগিয়ে আসবে।' তবে নিজেদের ব্যাপারে তারা ছিলো বেশ আত্মবিশ্বাসী। মনে মনে ভাবলো ঃ 'মক্কার কুরাইশরা যুদ্ধ বিদ্যায় তেমন পারদর্শী নয়। তাই মুসলমানরা এতো সহজে জয় পেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। যদি আমাদের সাথে তাদের শক্তি পরীক্ষা হয়, তাহলে তারা জব্দ হবে এটা নিশ্চিত।'

এমন ধারণা তৈরি হলো হাওয়াজিন ও সাকীফ গোত্রের লোকদের মধ্যে। তারা যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো। চার হাজার সৈন্য নিয়ে। মালিক ইবনে আওফ নেতৃত্ব দেবে এ যুদ্ধের। মক্কা আক্রমণ করবে সে ও তার দল। মুছে দেবে মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের অস্তিত্ব। হারিয়ে যাবে তারা এই মরু জনপদের মাটি থেকে।

এদিকে এ দুঃসংবাদ দূরত্বের বাধা পেরিয়ে দ্রুত পৌঁছে গেলো মক্কায়। মহানবী (সা.) কাছে। তিনিও প্রস্তুত হতে চাইলেন। সিদ্ধান্ত হলো প্রতিরোধ যুদ্ধে এগিয়ে যাবার।

অষ্টম হিজরি। শাওয়াল মাসের একদিন। হুনাইনের দিকে যাত্রা করলেন মহানবী (সা.)। বারো হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে। দুলদুল ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে। বিশাল বাহিনী। প্রচুর যুদ্ধ-সরঞ্জাম। আত্মপ্রত্যয়ী প্রত্যেকে। জয় সুনিশ্চিত। কারো কারো মুখ দিয়ে মনের অজান্তেই তাই বেরিয়ে এলো গৌরবদীপ্ত উক্তি ঃ

'আজ আমাদের সাথে যুদ্ধে জিতবে এমন সাধ্য কার?'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। হুনাইনের দ্বার প্রান্তে হাজির হলেন মুসলিমরা। তারা তাঁবু স্থাপন করলেন প্রবেশ পথে। অপেক্ষা করতে লাগলেন পরের দিন সূর্য ওঠা প্রভাতের জন্যে। কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের জন্যে।

রাত শেষ হলো। পূব আকাশে উঠলো লাল সূর্য। রণ-প্রস্তুতি নিলো মুসলিম বাহিনী। তারপর প্রবেশ করলো হুনাইনের সেই সংকীর্ণ গিরি পথে। পথ তো নয়, যেন প্রাচীর ঘেরা। দু'পাশে তখনো সকালের আলো ভালোভাবে ফুটে ওঠে নি। ঝাপসা দেখাচ্ছে চারিদিক। মুসলিম সেনারা কোনো শত্রু সৈন্যই দেখতে পেলেন না, কিন্তু শত্রুরা লুকিয়ে থাকা পাহাড়ের আড়াল থেকে তাদের দেখতে পেলো ঠিকই। যেখানে ওঁৎ পেতে ছিলো তারা। মালিক ইবনে আওফের নির্দেশে। সেখান থেকেই তীর বর্ষণ শুরু করলো মুসলিম বাহিনীর ওপর। বৃষ্টির মতো আসতে লাগলো অসংখ্য তীর। বিস্মিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো মুসলিম বাহিনী। আগের সারিতে ছিলো মক্কার নব দীক্ষিতরা। যুদ্ধের আশা ত্যাগ করে উর্ধ্ব শ্বাসে পালাতে লাগলো তারা। বাকিরা কিছু না বুঝেই অনুসরণ করলো প্রথমদের।

ওহুদ-যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর বিপর্যয় দেখা দিলো। সেই মুহূর্তে। মহানবীর (সা.) জীবনে কোনো যুদ্ধে এমনি অবস্থা আগে কখনো ঘটেনি। এই দুঃসময়ে নবীজীর নিকটে আবু বকর, আলী, ওমর, আব্বাসসহ মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী উপস্থিত ছিলেন।

শত্রুর তীর বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। তা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন নবী। দুলদুল ঘোড়ার আড়ালে আড়ালে। তাঁর চাচা আব্বাস (রা.) যাচ্ছেন ঘোড়ার লাগাম ধরে। আর সাহাবী হযরত আয়মন (রা.) হয়েছিলেন হুজুরের (সা.) দেহরক্ষী। তিনি হাঁটছিলেন নবীর একেবারে গা ঘেঁষে। ফলে শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি তীর এসে বিধলো তাঁর বুকে। সাথে সাথে শহীদ হলেন তিনি। তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শত্রুদেরই অনুকূলে। দ্রুত ধেয়ে আসছে তারা। একদল শত্রু সৈন্য যুদ্ধ করতে করতে প্রায় নবীজীর পাশেই এসে পড়লো। দূর থেকে তা লক্ষ্য করলেন হযরত আলী (রা.)। তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন তিনি। যুলফিকার দিয়ে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন তাদের। এ সময় মহানবীর (সা.) চাচা আব্বাসের ভূমিকা ছিলো খুবই বলিষ্ঠ ও

বুদ্ধিদীপ্ত। পলায়নরত সৈন্যদের ফিরিয়ে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তিনি। ডাক দিলেন উচ্চস্বরে ঃ

'হে বাবলা বৃক্ষের তলে শপথকারী মুসলিমরা! তোমরা না রাসূলের (সা.) হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলে– জান-মাল কুরবানির জন্যে। তবে এক্ষুণে চলে এসো। হুজুরে পাক এখানেই আছেন।'

হযরত আব্বাসের (রা.) এই মর্মস্পর্শী আহ্বানে কাজ হলো। সম্বিত ও সাহস ফিরে পেলেন সাহাবীরা। চলে এলেন সবাই। মহানবীর (সা.) পবিত্র সান্নিধ্যে। তারপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রু সৈন্যের ওপর। শিগ্‌গীরই মোড় ঘুরে গেলো যুদ্ধের। অল্পক্ষণের মধ্যে চরম পরাজয় ঘটলো অবিশ্বাসীদের। তাদের বহু সৈন্য নিহত হলো, বন্দীত্ব বরণ করলো সহস্রাধিক, আর বাকিরা প্রাণ বাঁচালো পালিয়ে।

এভাবে হুনাইনে শেষ পর্যন্ত জয় হলো মুসলমানদের। আর তা ইতিহাসে এক শিক্ষা হয়ে রইলো। মুসলমানরা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে দীপিত ঈমানের জোরে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিংবা গায়ের জোরে নয়। যুদ্ধে জয় আসে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে। যেমন জয় হয়েছিলো বদর, খন্দক, খায়বার, মূতা– সব যুদ্ধেই।

এ বিজয়ের ধারা বয়ে চলে খোলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তী শাসকদের আমলে। ইসলামের ইতিহাসের পাতায় তা যেমন রক্তরঞ্জিত তেমনি অর্ধ পৃথিবী সুশাসনের চিহ্নে প্রোজ্জ্বল, দ্যুতিময়।

হুনাইনের যুদ্ধে পরাজিত পলাতক সৈন্যরা আওতাস ও তায়েফে গিয়ে আশ্রয় নিলো। এখান থেকেই তারা আবার তরবারি উত্তোলন করলো ইসলামের বিরুদ্ধে। মহানবী (সা.) অবিশ্বাসীদের এ অপচেষ্টাও পণ্ড করে দিতে চাইলেন। অভিযান চালালেন আওতাস ও তায়েফের বিরুদ্ধে।

রাসূলে পাক (সা.) প্রথমে একদল সৈন্য পাঠালেন আওতাসে। এ বাহিনীর নেতা ছিলেন আবু আমের আশআরী (রা.)। তিনি সসৈন্যে আওতাসে পৌঁছালেন। সাথে সাথে শত্রুরাও প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করলো মুসলিম বাহিনীকে। শুরু হলো ভীষণ যুদ্ধ। এক সময় শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি তীর এসে লাগলো আবু আমেরের দেহে। ফলে শাহাদাত বরণ করলেন

তিনি। এরপর মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব নিলেন আবু মূসা আশআরী (রা.)। তিনিও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সৈন্য চালনা করলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর পরাজিত হলো শত্রুরা। তাদের বহু সৈন্য বন্দী হলো। বন্দীদের যখন নবীজীর সামনে আনা হলো, এক বৃদ্ধা বিনীতভাবে বললো ঃ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ হতভাগিনী তো আপনারই বোন।'

'তার প্রমাণ কি?' জিজ্ঞেস করলেন নবী।

'প্রমাণ আছে। আমার পিঠের এই ক্ষত চিহ্নটি দেখুন– বাল্যকালে একদিন আপনি দাঁত দিয়ে আমার পিঠ কেটে দিয়ে ছিলেন।' পিঠ আগলা করে দেখালো বৃদ্ধা।

সাথে সাথে শৈশব স্মৃতি জেগে উঠলো নবীর (সা.)। চিনতে পারলেন বৃদ্ধাকে। এই তো সেই দুধ বোন শায়মা। যার অপার স্নেহের ছায়ায় পার হয়েছে তাঁর শৈশব।

বোনের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার আবেগে অশ্রু ভারাক্রান্ত হলেন নবী। নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে বোনকে বসালেন। তারপর স্নেহপূর্ণ কথাবার্তা বললেন তাঁর সাথে। আলাপ শেষে বললেন, 'ইচ্ছা হলে তুমি আমার কাছে থাকতে পারো, ইচ্ছা হলে নিজের কবিলায় ফিরে যেতে পারো।'

শায়মা সঙ্গে সঙ্গে হুজুরের হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন, 'আমি নিজের গোত্রে ফিরে যাব।'

নিজ কবিলায় ফিরে যাচ্ছেন শায়মা। হুজুর (সা.) উপহার হিসেবে বহু মালপত্র সঙ্গে দিলেন তার। তারপর বিশ্বস্ত সহচর দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন বোনকে। আর এই দুধ বোনের মুক্তির উসিলায় বাকি বন্দীদেরও মুক্তি দিলেন নবী।

ওদিকে ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে তায়েফের সাকীফ গোত্র। কট্টর অবিশ্বাসী তারা। এবার নবীজীর নজর গেলো সেদিকে। তায়েফ অবরোধ করলেন তিনি। অবিশ্বাসীরা সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিলো। সেখান থেকে আক্রমণ করতে লাগলো তীব্রভাবে। অবরোধ স্থায়ী হলো বিশ দিন। তবু দুর্গের বাইরে এলো না শত্রুরা। মহানবী (সা.) বুঝলেন, ওদের মেরুদণ্ড

একেবারে ভেঙ্গে গেছে। আর কোনো দিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না ওরা, পারবে না ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে।

তখন তিনি অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে বিদায় হলেন, আর তায়েফবাসীর জন্যে দোয়া করলেন এই বলে ঃ

'হে আল্লাহ! তুমি এদের হেদায়েত করো এবং আমার কাছে আসার তৌফিক দাও।'

দেখতে দেখতে কেটে গেলো একটি বছর। এলো নবম হিজরি। কিন্তু স্বস্তি এলো না মুসলিমদের মনে। এগিয়ে আসছেন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস। বিশাল বাহিনী নিয়ে। মদীনা আক্রমণ করবেন তিনি। তাই বাধা দিতে হবে তাকে, রক্ষা করতে হবে ইসলামের সদ্য রচিত প্রাসাদ। এই কারণে আবারও তৈরি হতে হলো মুসলিমদের।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিরাক্লিয়াসের সামরিক অভিযান এই প্রথম নয়। এক বছর আগেও একবার সসৈন্যে এসেছিলেন তিনি। মূতা প্রান্তরে। কিন্তু সে যুদ্ধের ফল মোটেই শুভ হয়নি। দু'লাখ সুশিক্ষিত রোমান সৈন্য নিয়েও শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে তাকে। ফিরতে হয়েছে চরম অপমানিত হয়ে।

সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চাইলেন হিরাক্লিয়াস। সৈন্য সংগ্রহ করলেন সমস্ত সিরিয়া থেকে। আরবের বেশ কিছু অবিশ্বাসী গোত্রও যোগ দিলো রোমান সেনাদলে। এক বছরের আগাম বেতনও পেলো তারা। তৈরি হলো চল্লিশ হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী। তারপর সে বাহিনী এগিয়ে এলো মদীনার দিকে। অবস্থান নিলো আরবের প্রান্ত সীমানা কোবাদে।

রোমান বাহিনীর এই বিপুল সমর আয়োজনের কথা গোপন রইলো না রাসূলের (সা.) কাছে। সিরিয়া থেকে ফিরে আসা সওদাগররা এ সংবাদ জানিয়ে দিলেন তাঁকে। খুবই চিন্তায় পড়ে গেলেন নবী। রোম সাম্রাজ্যের মতো বিশাল শক্তির সাথে যুদ্ধ করা সহজ নয়। কিন্তু উপায় কি। শত্রু যখন গায়ে পড়ে এগিয়ে এসেছে, তখন তার তো প্রতিরোধ করতেই হবে।

তাই রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনে লেগে গেলেন নবী (সা.) আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে সৈন্য চেয়ে লোক পাঠালেন। যুদ্ধের ব্যয়

নির্বাহের জন্যে সাহাবীদের সাধ্যানুযায়ী দান করতে বললেন। ব্যাপক সাড়া এলো সবদিক থেকে। মক্কা বিজয়ের পর অধিকাংশ আরব গোত্র বশ্যতা স্বীকার করেছে নবীর। তারা সৈন্য ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলো। সাহাবীরাও দানের হাত বাড়িয়ে দিলেন। অভূতপূর্ব সে দান।

হযরত ওসমান (রা.) দিলেন এক হাজার উট, সত্তরটি ঘোড়া ও এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা। হযরত ওমর (রা.) দান করলেন তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সবকিছু নিয়ে হাজির হলেন নবীর (সা.) কাছে। নবী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পরিবারবর্গের জন্যে কি রেখেছো?'

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে।' জবাব দিলেন আবু বকর (রা.)।

তখন প্রচণ্ড গরম। দেশেও দুর্ভিক্ষ। সামান্য যে শস্য হয়েছে, তাতেও পাক ধরেছে। এই সময় কারো পক্ষে বাড়ির বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মুসলিমরা জিহাদের অমীয় আকাঙ্ক্ষায় আকুল। অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে নিলেন সবাই। প্রস্তুত হলো ত্রিশ হাজার সৈন্য। তারপর রজব মাসের মধ্যভাগের কোনো একদিন রাসূলের (সা.) নেতৃত্বে বেরুলেন তাঁরা। দুর্ধর্ষ রোমান বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্যে।

কংকরময় দীর্ঘ পথ। মাথার ওপর উত্তপ্ত সূর্য। পায়ের নিচে তপ্ত বালুকারাশি। বাতাসও গরম। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট। তবু আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ সৈনিকরা চলেছেন। সেই দুর্গম পথে।

কয়েক দিন অবিরাম পথ চলার পর পৌঁছে গেলেন নবী (সা.)। তাঁর অনুসারীদের নিয়ে। সিরিয়া সীমান্তের তাবুক প্রান্তরে। শিবির স্থাপন করলেন সেখানেই। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলেন রোমান বাহিনীর উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য।

ওদিকে মহানবীর (সা.) তাবুকে আসার খবর পেলেন হিরাক্লিয়াস। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা তাঁর আগে থেকেই ছিলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'এই বিশাল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া অসম্ভব। মুতার যুদ্ধে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কি বীরত্বের সাথে লড়েছে তারা। শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি চাপিয়ে দিয়েছে আমাদেরই ঘাড়ে। আর

এবার তো তাদের সৈন্য সংখ্যা দশগুণ বেশি।' ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হলো তার অবিশ্বাসী অন্তরে। তাই যুদ্ধ না করে সসৈন্যে ফিরে গেলেন তিনি।

মহানবী (সা.) তাবুকে থাকলেন বিশ দিন। এ সময় আশপাশের খ্রিস্টান ও ইহূদীরা এলো তাঁর কাছে। বশ্যতা স্বীকার করলো তারা। অনেকে আবার ধন্য হলো ইসলাম গ্রহণ করে।

তাবুকে যুদ্ধ আর হলো না। ঝরলো না কারো রক্ত। খুব খুশি হলেন নবী (সা.)। খুশি মনে মদীনায় ফিরে এলেন তিনি। তখন বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিরা আসতে লাগলো নবীর কাছে। ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো দলে দলে। সত্যের আলো আরো ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে।

## চৌদ্দ

পার হলো আরো একটি বছর। এলো দশম হিজরি। ইসলাম বিস্তারের ধারা বয়ে চললো আগের মতোই। দেশ-বিদেশের প্রতিনিধি দল একের পর এক আসতে লাগলো মদীনায়। নবীর (সা.) কাছে প্রশ্ন করে তারা। অনেক প্রশ্ন। নবী হাসিমুখে জবাব দেন সেসব প্রশ্নের। উত্তর পেয়ে খুশি হয় আগন্তুকরা। বিশ্বাসের দুয়ার খুলে যায় তাদের। অকৃত্রিম বিশ্বাস ও ভক্তিতে নবীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় তারা। ঘোষণা করে ঈমানের কলেমা, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

ঈমানের আলো বুকে নিয়ে নও মুসলিমরা ফিরে যায় দেশে, নিজ গোত্রে। ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে সেখানেও। বিকশিত হয় বুক থেকে বুকে। আবার কোনো কোনো দল ইসলাম গ্রহণের পরও কিছু দিনের জন্যে রয়ে যায় মদীনায়। ইসলামের বিধি-বিধান ভালোভাবে শেখে তারা। তারপর ফিরে যায় দেশে। এভাবে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো চারিদিকে। বিশ্বনবীর (সা.) জীবনকালেই এ সত্যের আলো মরু আরবকে উদ্ভাসিত করে পৌঁছে গেলো দেশে দেশে। পূর্ণ হলো আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। নবীজী বুঝলেন, তাঁর জীবনের মহাব্রত তাওহীদের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে। এবার বিদায় নিতে হবে তাঁকে। ফিরে যেতে হবে প্রভুর কাছে। তাই প্রস্তুত হতে লাগলেন নবী।

মাস যায়, এক এক করে। শাওয়াল গেলো। জিলকদ এলো। সামনে জিলহজ্জ মাস। হজ্জের সময়। জীবনের শেষ হজ্জ সম্পন্ন করতে চাইলেন নবী (সা.)। ঘোষণা করলেন যাত্রার তারিখ। শুরু হলো আয়োজন। দূত পাঠানো হলো দিকে দিকে। নবীর সাথে হজ্জ যাত্রা। পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আনন্দে নেচে উঠলো মুসলমানদের প্রাণ। চারিদিক থেকে হজ্জ যাত্রীরা দলে দলে আসতে লাগলেন মদীনায়। সমবেত হলেন নবীর পাশে।

শেষ হলো সকল প্রস্তুতি। জিলকদের পঁচিশ তারিখে রওয়ানা হলেন নবী (সা.)। গোটা জাজিরাতুল আরব হতে প্রায় দু'লক্ষ হজ্জযাত্রী সঙ্গী হলেন তাঁর।

জিলহজ্জ মাসের চার তারিখ। মক্কায় পৌছালেন নবী (সা.) ও তাঁর সঙ্গীরা। প্রথমেই তিনি কাবা ঘর তাওয়াফ করলেন। তারপর মাকামে ইব্রাহীমে নামায পড়লেন দু'রাকাত। অতঃপর সায়ী করলেন সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে। সেখান থেকে সহচরদের সঙ্গে নিয়ে চললেন মিনার উদ্দেশে। আটই জিলহজ্জ। বৃহস্পতিবার। মিনায় পৌছালেন তিনি। নয়ই জিলহজ্জ গেলেন আরাফাতে। বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হলো আরাফাত ময়দান। সেই তরঙ্গায়িত জনসমুদ্রে নবী প্রদান করলেন এক ঐতিহাসিক ভাষণ। মানব ইতিহাসে সে ভাষণের তুলনা নেই।

ভাষণের শেষ দিকে জ্যোর্তিময় হয়ে উঠলো রাসূলের মুখমণ্ডল। কণ্ঠস্বর হয়ে এলো গম্ভীর। আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'হে আল্লাহ, হে আমার প্রভু, আমি কি তোমার বাণী পৌছে দিতে পেরেছি?' সাথে সাথে লক্ষ কণ্ঠে আওয়ায হলো, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

একথা শুনে রাসূল (সা) আকাশের দিকে তিনবার অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন ঃ

'হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো, তুমি সাক্ষী থাকো, তুমি সাক্ষী থাকো।'

এমনি সময় নাযিল হলো পাক কুরআনের শেষ আয়াত ঃ

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পন্ন করে দিলাম আর ইসলামকে দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।' (সূরা মায়েদা ঃ ৩)

নবীজী সাথে সাথে এ আয়াত পড়ে সকলকে শুনালেন। খুশির জোয়ার

এলো সাহাবীদের মনে। সবার ঠোঁটে ফুটে উঠলো হাসির রেখা। কেবল কেঁদে ফেললেন হযরত আবু বকর (রা.)। রাসূলের (সা.) আসন্ন বিদায়ের বেদনায়।

ভাষণ শেষে চুপ করলেন নবী (সা.)। চুপ রইলো সমবেত জনতাও। নিবিড় নীরবতা নেমে এলো আরাফাত ময়দানে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। বিদায়ের সুর যেন বেজে উঠেছে সবার হৃদয়ে।

রাসূলের (সা.) হৃদয়ে জাগলো মিশ্র অনুভূতি। একদিকে কর্মের স্বীকৃতি। বিনিময়ে মহামিলনের আনন্দ। অন্যদিকে বাঁধন ছিন্ন করার বেদনা। এই মিলন ও বিরহের অনুভূতি কিছুক্ষণের জন্যে বিহ্বল করে তুললো নবীকে (সা.)। ক্ষণকাল পরে সমবেত মুসলমানদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন তিনি।

এরপরের তিন দিন মিনায় থাকলেন নবী। জিলহজ্জের তেরো তারিখ খানায় কাবার আখেরী তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন তিনি। তারপর সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে এলেন মদীনায়।

একাদশ হিজরি। নবীর (সা.) কর্ম সুসম্পন্ন হয়েছে। ইসলামের আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে অন্ধকার আরব সীমানা। বারো লাখ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে কায়েম হয়েছে আল্লাহর আইন, ইসলামী হুকুমত। এবার পরপারে গমনের জন্যে প্রস্তুত হলেন নবী।

তিনি জীবনের এই অন্তিম সময়ে অবশিষ্ট কাজগুলো দ্রুত শেষ করতে চাইলেন। মুসলমানদের ইসলামের বিধি-বিধান সঠিকভাবে শিক্ষা দেয়ার জন্যে শিক্ষক পাঠালেন দিকে দিকে। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, যাকাত সংগ্রহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে কর্মকর্তা নিয়োগ করলেন বিভিন্ন প্রদেশে। তারপর একদিন গেলেন ওহুদ প্রান্তরে। শহীদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করলেন, তাঁদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে।

এরপরই ওসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে এক সামরিক অভিযান পাঠালেন সিরিয়ায়। মুসলিম দূত হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে এ অভিযান প্রেরণ করা। সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলো সেনাবাহিনী। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা) সহ সকল বিশিষ্ট সাহাবী অংশ নিলেন এতে। তাঁরা মদীনার শহরতলী পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। তখনই রাসূলের (সা.) অসুস্থতার খবর পৌঁছালো সেখানে। ফলে স্থগিত হলো সিরিয়া

অভিযান। মদীনায় ফিরে এলেন সবাই।

সফর মাসের শেষ দিকে 'জান্নাতুল বাকি' কবরস্থানে গিয়ে ছিলেন নবী (সা.)। কবরবাসীদের জন্যে দোয়া করে ফিরে এলেন তিনি। তখন প্রচণ্ড মাথা যন্ত্রণা শুরু হলো তাঁর। ক্রমে বাড়তে লাগলো সে যন্ত্রণা। খুব দুর্বল হয়ে পড়লেন নবী। তিনি এতো দুর্বল হলেন যে নামাজে যেতেও সক্ষম হচ্ছিলেন না। তাই ইমামতি করতে লাগলেন হযরত আবু বকর (রা.)।

মাঝে একদিন একটু সুস্থতা বোধ করলেন। চলে গেলেন মসজিদে। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে দিলেন জীবনের শেষ ভাষণ ঃ

'আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দু'টি বিষয়ে অধিকার দিয়েছেন। হয় সে দুনিয়া গ্রহণ করুক, না হয় পরকাল গ্রহণ করুক। বান্দা পরকালই বেছে নিয়েছে।

আমি সবচে' বেশি ঋণী আবু বকরের সম্পদ ও সাহচর্যের কাছে। দুনিয়ার কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু বন্ধুত্বের চেয়ে ইসলামের ভ্রাতৃত্বই উত্তম।

শোন, অতীতের জাতিগুলো তাদের নবী ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের কবরগুলোকে ইবাদতখানা বানিয়ে ছিলো। তোমরা সেরূপ করো না। আমি তোমাদের স্পষ্টভাবে নিষেধ করছি।

......................।'

রবিউল আওয়ালের বারো তারিখ। দিন গড়াতে লাগলো। নবীর (সা.) শারীরিক অবস্থার আবার অবনতি হলো। বার বার বেহুঁশ হতে লাগলেন তিনি। একবার একটু হুঁশ ফিরে এলেই বলে উঠলেন এই কথাগুলো ঃ

'আল্লাহ যাঁদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন তাঁদের সাথে।

'হে আল্লাহ, মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে।'

'তিনিই মহান বন্ধু।'

তাঁর অবস্থার আরো অবনতি হলো। এক সময় বন্ধ হয়ে গেলো দু'চোখ। শীতল হলো দেহ।

(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।)

মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লো। চারিদিক থেকে শোকাকুল সাহাবারা আসতে লাগলেন, দলে দলে। বিশ্বনবীকে (সা.) দু'চোখ ভরে একবার দেখতে চান সবাই। শেষ দেখা।

## পনেরো

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়শার (রা.) হুজরায় প্রাণের নবীর (সা.) প্রাণহীন লাশ। দাফন হয়নি তখনো। শোকাহত সাহাবীদের ভিড়। কান্না জড়ানো কণ্ঠ, চোখে বাঁধনহারা অশ্রু। সবার ভাবনার আবর্তে যেনো ঘুরপাক খায় একটি কথা ঃ 'কে হবেন পরবর্তী নেতা ? কে হেবন এই শিশু ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার ?'

দাফনের আগেই তাই এই বিতর্কিত বিষয়ের ফয়সালা করতে চাইলেন সবাই। কেননা নেতা ছাড়া কোনো বিষয়ের চূড়ান্ত সাফল্যে আসা যাবে না। একক চিন্তা, একক সিদ্ধান্ত একান্তই জরুরি। সবাই নির্দেশ দিলে কে শোনবে কার কথা।

শুরুতেই তারা ভাগ হয়ে গেলো দু'দলে। দুই মতের মানুষ। মুহাজির ও আনসার। উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। খেলাফতের দাবিদার উভয়েই। চললো তর্ক-বিতর্ক, মতভেদ, বাক-বিতণ্ডা।

মক্কার মুহাজিররা বলতে চাইলেন ঃ খলিফা নির্বাচিত হবেন তাঁদের মধ্য থেকে। কেননা তাঁরাই আল্লাহর রাসূলকে প্রথমেই রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাসের শক্ত বুনিয়াদ তো তারাই রচনা করেছেন। মাতৃভূমি, বন্ধু-স্বজন ছেড়ে তারাই নবীর আহ্বানে মদীনায় হিজরত করেন।

আবার মদীনার আনসার সাহাবীরাও দাবি তুললেন নেতা তাঁদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হবেন। কেননা তারাই রাসূলের (সা.) হাতে হাত রেখে ঈমান এনেছেন। সাহায্য করেছেন সম্পদ ও জীবন দিয়ে। তাই তাঁদের খেলাফতের দাবিও অগ্রাহ্য নয়।

এ সময় হযরত আবু বকরই (রা.) সমবেত আনসার সাহাবাদের উদ্দেশে বললেন ঃ 'প্রিয় আনসার ভাইরা! আপনাদের দান ও ত্যাগ সম্পর্কে মুহাজিররা অবগত। আপনাদের উদারতা ও মহানুভবতার কথা তাঁরা চিরদিন স্মরণে রাখবেন। ইতিহাসেও তা সোনার হরফে লেখা থাকবে। তবে

একথাও সত্য যে, মক্কার মুহাজিররাই সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁদেরকে সহ্য করতে হয়েছে কাফেরদের নির্মম নির্যাতন। আর তাঁদের জন্মভূমিতেই রাসূল (সা.) জন্ম নিয়েছিলেন। মুহাজিররাও কুরাইশ বংশোদ্ভূত। তাঁদের সাথে রয়েছে রাসূলের (সা.) রক্তের সম্পর্ক। এসব কারণে খেলাফতের দাবিদার তাঁরাই। আপনাদের সকলের সাথে পরামর্শ করে তাই মুহাজিরদের মধ্য হতেই খলিফা নির্বাচন করতে চাই।'

আনসাররা তবুও তাঁদের দাবি প্রত্যাহার করলেন না। তাঁদের এক নেতা বললেন, 'তবে দু'পক্ষ হতে দু'জন খলিফা নির্বাচিত হোক।'

আনসারী নেতার এ মতের তীব্র বিরোধিতা করলেন হযরত আবু ওবায়দা (রা.)। তিনি বললেন, 'হে আনসার ভাইরা! দু'জন খলিফা হলে মতভেদ হবে দু'জনের মধ্যে। ফলে সৃষ্টি হবে অনেক সমস্যা ও বিভেদ। চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে আমাদের প্রাণতুল্য ইসলাম।'

এমনি তর্ক-বিতর্কের মাঝখানে কথা বললেন এক আনসারী নেতা। আনসারদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলে উঠলেন, 'হে আনসার ভাইরা! হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন আল্লাহর নবী। তাঁকে সাহায্য করে আমরা আল্লাহর কাজেই সাহায্য করেছি। পালন করেছি প্রভু পালয়িতার নির্দেশ। এ কাজের পুরস্কার আমরা তাঁর কাছ থেকেই লাভ করবো। এর প্রতিদান আমরা অন্য কোনভাবে পেতে চাই না। তাই আমি প্রস্তাব করছি কুরাইশ বংশ হতেই খলিফা নির্বাচিত হোক।'

এবার নীরব হলেন আনসাররা। মেনে নিলেন তাঁদের নেতার প্রস্তাব। তখন আবু বকর (রা.) বললেন ঃ 'আমার বিবেচনায় ওমর (রা.) ও আবু ওবায়দা (রা.) দু'জনই খলিফা হবার যোগ্য। তাই এঁদের মধ্য হতে একজনকে খলিফা নির্বাচিত করা হোক।'

হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'হে আবু বকর! আপনি আমাদের চেয়েও যোগ্য। রাসূলের (সা.) জীবিতাবস্থায় তাঁর পক্ষ হতে আপনিই নামাযের ইমামতি করেছেন। কাজেই আপনি খলিফা হবার যোগ্য ব্যক্তি। আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, আমরা সকলে আপনার হাতে হাত রেখে বায়আত হই।'

হযরত আবু বকর তখনো হাত বাড়ালেন না। বসে রইলেন নীরবে। তখন এগিয়ে গেলেন হযরত ওমর (রা.)। টেনে ধরলেন আবু বকরের হাত। বায়আত হলেন তাঁর হাতে হাত রেখে। এরপর আবু ওবায়দাও আবু বকরের হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ নিলেন। তারপর মসজিদে নববীতে জমায়েত হলেন সাহাবারা, দলে দলে। বায়আত হতে লাগলেন, একে একে।

এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বীকৃতিতে মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হলেন হযরত আবু বকর (রা).। তারপর সবাই মিলে দাফন করলেন বিশ্বনবীর (সা.) পবিত্র লাশ। বুধবার মধ্যরাতে।

মদীনা রাষ্ট্রে প্রথম খলিফার আসনে বসলেন হযরত আবু বকর (রা.)। শুরু হলো স্বর্ণালী যুগ। শুধু স্বর্ণালী নয়, রক্তাক্ত ইতিহাস-ও রচিত হয়েছিলো এ সময়।

খলিফা নির্বাচিত হবার সাথে সাথে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হলেন হযরত আবু বকর (রা.)। পাহাড় সমান সে সমস্যা। স্বধর্মত্যাগীদের তৎপরতা, যাকাত অস্বীকারকারীদের গোলযোগ, মোনাফিকদের ষড়যন্ত্র, ভণ্ড নবীদের আবির্ভাব, পারস্য ও রোম সম্রাটের শত্রুতা– এসব বাধার পাহাড় চারিদিক থেকে এগিয়ে এলো তাঁর সামনে। তবু ভয় পেলেন না খলিফা। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে তিনি এসব বিপদের মোকাবিলা করতে চাইলেন, একটি একটি করে।

খেলাফত লাভ করে আবু বকর প্রথমেই চাইলেন মহানবীর (সা.) অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করতে। আর তা হলো ওসামা বিন যায়েদের (রা.) নেতৃত্বে সিরিয়া সীমান্তে অভিযান। মহানবী (সা.) মৃত্যুর পূর্বে যে অভিযান পাঠিয়ে ছিলেন তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারেস হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। কিন্তু নবীজীর প্রেরিত সেনাবাহিনী পৌঁছাতে পারেনি সিরিয়ায়। কিছু দূর গিয়ে ফিরে এসেছিলো। নবীর (সা.) অসুস্থতার খবর পেয়ে। খলিফা আবু বকর (রা.) চাইলেন নবীর সেই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে। তাই খলিফা হবার পর দিনই ওসামার নেতৃত্বে সৈন্য পাঠালেন সিরিয়ায়। এই সেনাদলে অংশ নিলেন অনেক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সাহাবী।

মুসলিম বাহিনী ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্তী অঞ্চল জাফফা ও আকেলনের মধ্যবর্তী উবনায় গিয়ে পৌছালো। সেখানেই বিদ্রোহীদের সাথে মুসলিম বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হলো। চল্লিশ দিন ধরে যুদ্ধের পর পরাজিত হলো বিদ্রোহীরা।

সিরিয়ায় সৈন্য বাহিনী পাঠানোর পর আবু বকর (রা.) মদীনা সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রহরী মোতায়েন করলেন সীমান্তের চারিদিকে। সেই প্রহরী দলের নেতৃত্বে রাখা হলো হযরত আলী (রা.), যুবাইর (রা.) ও তালহাকে (রা.)।

এমনি সময় দেখা দিলো এক কঠিন সমস্যা। যাকাত অস্বীকারকারীদের বিদ্রোহ। মদীনার উত্তর দিকে ছিলো বনু আবস্ ও বনু ধুবিয়ান গোত্রের বেদুঈনদের বাস। বড়ই দুর্ধর্ষ ও দাম্ভিক তারা। যাকাত মওকূফ করার দাবি জানালো তারা। প্রতিনিধি পাঠালো খলিফার কাছে। খলিফা এ ব্যাপারে খুব কঠোর ও দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করলেন। তিনি রাগের সাথে ঘোষণা করলেন ঃ

'কেউ যদি একটি ছাগীর বাচ্চা যা রাসূলুল্লাহর সময়ে যাকাত হিসেবে পাঠানো হতো তা দিতে অস্বীকার করে, আমি তার বিরুদ্ধেও লড়াই করবো।'

একথা শুনে খুবই ক্ষিপ্ত হলো বেদুঈনরা। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো তারা। যুদ্ধের জন্যে একত্রিত হলো। মদীনা হতে বারো মাইল দূরে। যুলকিচ্ছা নামক স্থানে।

ইতোমধ্যে ফিরে এলো ওসামার নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী। খলিফা তাঁকে মদীনা রক্ষার দায়িত্ব দিলেন। তারপর নিজে গেলেন বিদ্রোহ দমনে। এক সেনাবাহিনী নিয়ে।

যুলকিচ্ছায় বেদুঈনদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ হলো মুসলিম বাহিনীর। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলো বেদুঈনরা। তখন অন্য যাকাত অস্বীকারকারীরা ইসলামের বিধান মেনে নিলো। খলিফার দরবারে নিয়মিত যাকাত পাঠাতে অঙ্গিকার করলো তারা।

ওদিকে ভণ্ড নবীরাও সৃষ্টি করলো আরেক বিপর্যয়। এরা ছিলো চারজন। আসওয়াদ আনাসী, মুসায়লামাতুল কাযযাব, তুলায়হা ও সাজাহ্। এরা নিজ নিজ গোত্রের লোকদের সংগঠিত করে নিজেদেরকে নবী বলে দাবি করেছিলো। নব দীক্ষিত মুসলমানরাও আকৃষ্ট হয় এদের প্রতি।

এসব ভণ্ড নবী ও ধর্মত্যাগীদের শক্ত হাতে দমন করতে চাইলেন খলিফা। তিনি সমস্ত সৈন্যদের এগারটি দলে ভাগ করলেন। সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এগার জন বিখ্যাত বীরকে। তারপর তাদের এক এক জনের নেতৃত্বে পাঠালেন সেনা অভিযান।

ভণ্ড নবীদের সারিতে প্রথমে ছিলো ইয়ামেনের অধিবাসী আসওয়াদ আনাসী। মহানবীর (সা.) জীবনের শেষ দিকেই সে নিজেকে নবী বলে দাবি করে। কয়েকটি গোত্র প্রধানের সাথে গোপন চুক্তি হয় তার। তাতে তার শক্তি ও সাহস বেড়ে যায়, বহুগুণে। ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সে। এমনকি রাসূলের (সা.) নিযুক্ত শাসনকর্তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। দখল করে সাজরান প্রদেশ। ইয়ামনের রাজধানীও চলে যায় তার দখলে। শুধু তাই নয়, রাজধানীর শাসনকর্তাকে সে হত্যা করে তাঁর স্ত্রীকে বিয়ে করলো।

এ সংবাদ মদীনায় মহানবীর (সা.) কাছে পৌছে গেলো। তিনি মুয়ায ইবনে জাবালকে আসওয়াদের বিরুদ্ধে পাঠালেন। মুয়ায পূর্ববর্তী শাসনকর্তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করলেন। তারপর এক রাত্রে আসওয়াদের গোপন কক্ষে ঢুকে তাকে হত্যা করলেন। মহানবীর (সা.) ইনতিকালের মাত্র কিছু দিন আগে হত্যা করা হয় আসওয়াদকে।

ইতোমধ্যে তিরোধান হলো মহানবীর (সা.)। খলিফা নির্বাচিত হলেন হযরত আবু বকর (রা.)। আর এ সময় আসওয়াদের অনুচররা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। আবু বকর অভিযান পাঠালেন তাদের বিরুদ্ধে। কঠোর হস্তে দমন করলেন সেই বিদ্রোহীদের।

ভণ্ড নবীদের মধ্যে সবচে' জঘন্য ছিলো ইয়ামামার অধিবাসী মুসায়লামাতুল কায্যাব। সেও রাসূলের (সা.) জীবনের শেষদিকে নিজেকে নবী বলে দাবি

করে। নবীজী তার কাছে পত্র পাঠালেন, পরিত্যাগ করতে বললেন এই মিথ্যা দাবি। কিন্তু তাতেও বোধ উদয় হলো না মুসায়লামার। ভণ্ডামী ত্যাগ করতে পারলো না সে। তার এ ভণ্ডামী আরো চরমে উঠে হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে। আশ পাশের বেশ কয়েকটি গোত্রের লোক যোগ দেয় এই পাপিষ্ঠের সাথে, তারা নবী বলে স্বীকার করে নেয় তাকে। তার অনুচরের সংখ্যা দাঁড়ায় চল্লিশ হাজারে। তাদেরকে একত্রিত করে মদীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলো মুসায়লামা।

খলিফা আবু বকর (রা.) ইকরামা ইবনে আবু জেহেল (রা.)-কে পাঠালেন মুসায়লামার বিরুদ্ধে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিলে এলেন তিনি। এরপর পাঠানো হলো খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) কে। তিনি ইয়ামামায় আক্রমণ করলেন মুসায়লামাকে। পরাজিত হয়ে সসৈন্যে পলায়ন করলো সে। আশ্রয় নিলো প্রাচীর বেষ্টিত এক বাগানে। মুসলিম বাহিনীও আক্রমণ করলো সে বাগান। রক্তের স্রোত বয়ে গেলো। নিহত হলো মুসায়লামা। সেই সাথে তার দশ হাজার সৈন্য।

এ যুদ্ধে মুসলমানদেরও ক্ষতি হয়েছিলো ব্যাপক। শাহাদাতত বরণ করেন দু'হাজার বিশিষ্ট সাহাবী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বহু হাফেযে কুরআন।

নজদের বনি আসাদ গোত্রপতি তুলায়হা। বিশ্বনবীর (সা.) মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে নবী হবার সাধ জেগে ছিলো তার মনেও। আবু বকরের খেলাফতকালে নিজেকে নবী বলে ঘোষণা করলো সে। খলিফা খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে পাঠালেন তুলায়হার বিরুদ্ধে। তিনি বুজাখার যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন তাকে। দলবলসহ পালিয়ে গেলো তুলায়হা। আশ্রয় নিলো সিরিয়ায় গিয়ে। অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হতে লাগলো সে। তাই এক সময় তওবা করলো। ফিরে এলো ইসলামে।

নবুয়তের দাবি করলো সাজাহ নামের এক মহিলাও। মধ্য আরবের ইয়ারবু খ্রিস্টান গোত্রে জন্ম নিয়েছিলো সে। সাজাহ সাজিয়ে গুছিয়ে কয়েকটি বাক্য লিখে বললো ঃ 'আমি আল্লাহর নবী। আমার কাছে এই ওহী নাযিল হয়েছে।'

সাজাহর এ মিথ্যা দাবির সমর্থন দিলো কয়েকটি গোত্র; কিন্তু তা নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখী হতে সাহস হলো না তার। তাই যোগ দিলো পুরুষ ভণ্ড নবী মুসায়লামার সাথে। শুধু তাই নয়, তার সাথে বিয়েও করলো সে। এবার উভয়ের মিলিত শক্তি নিয়ে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিলো।

কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি সাজাহর। তার আগেই মুসায়লামা নিহত হয়েছিলো মুসলিম বাহিনীর হাতে। তারপর মহাবীর খালিদের নেতৃত্বে বিরাট মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হলো সাজাহর বিরুদ্ধে। সেই বিশাল সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধ করতে সাহস পেলো না সাজাহ। তাই সে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পালিয়ে গেলো। মেসোপটোমিয়ায়। যেখানে বাস করতো তার স্বগোত্র তাগলিবের লোকেরা।

এভাবে ভণ্ড নবী ও ধর্মত্যাগীদের শক্ত হাতে দমন করলেন খলিফা। নিভে গেলো বিদ্রোহের আগুন। শান্ত হলো পরিবেশ। ইসলামের আলোয় আবার আলোময় হলো আরব সীমানা। এবার সীমান্তের দিকে নজর দিলেন খলিফা।

আরবের পূর্ব প্রান্তে পারস্যের সীমান্ত এলাকা। পারস্য রাজের মদদপুষ্ট অবিশ্বাসীদের বাস। কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী তারা। উদীয়মান ইসলামী শক্তিকে ধ্বংস করাই তাদের অভিলাষ। রিদ্দা যুদ্ধের সময়ও মুসলমানদের বিপক্ষে গিয়েছিলো তারা। সাহায্য করেছিলো ধর্মত্যাগীদের, নানাভাবে। ভণ্ড নবী তুলায়হা ও সাজাহ ছিলো তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্যপুষ্ট। এসব কারণে পারসিকদের প্রতি ক্ষিপ্ত হলো মুসলিমরা। অনিবার্য হয়ে উঠলো পারস্য অভিযান।

তেরো হিজরি। খেলাফতের দ্বিতীয় বর্ষ। পারস্য সীমান্তে অভিযান পাঠালেন খলিফা। প্রথমে সেনাপতি মুসান্নার নেতৃত্বে। আট হাজার সৈন্যের সে বাহিনী। কিন্তু এতেও পুরোপুরি ভরসা পেলেন না খলিফা। তাই মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে পাঠালেন দশ হাজার সৈন্যের আরেক বাহিনী। যাত্রাকালে দুই বাহিনীর প্রধানদের খলিফা নির্দেশ দিলেন ঃ

'যারা বশ্যতা স্বীকার করবে, তাদের আঘাত করবে না। শুধু যারা

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে, তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে। শত্রুপক্ষের বালক-বালিকা, বৃদ্ধ ও নারীদের কখনো হত্যা করবে না। ফলবান বৃক্ষ, বাগান ও শস্যক্ষেত্র নষ্ট করবে না, কারো ঘর-বাড়ি জ্বালাবে না।'

উবুল্লায় মিলিত হলো দুই মুসলিম বাহিনী। ওদিক থেকে সসৈন্যে এগিয়ে এলো পারসিক শাসনকর্তা হরমুজ। হাফির নামক স্থানে সংঘর্ষ হলো মুসলিম ও পারসিকদের মধ্যে। পারসিকরা পরাজিত হলো। পরাজিত সৈন্যরা পালিয়ে গেলো মেসোপটেমিয়ার দিকে। শাসনকর্তা হরমুজ তাদের ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। অবশেষে খালিদ ও হরমুজের মধ্যে হলো দ্বৈত যুদ্ধ। যুদ্ধে নিহত হলেন হরমুজ।

তারপর মুসলিম বাহিনী পিছু ধাওয়া করলো পলায়নরত পারসিক সৈন্যদের। তাড়িয়ে নিয়ে গেলো ইউফ্রেতিস নদীর তীর ধরে পূর্ব দিকে। এ সময় মুসলমানরা এক পারসিক রাজকন্যার দুর্গ দখল করলেন।

এরপর হীরা অবরোধ করা হলো। আত্মসমর্পণ করলেন সেখানকার নাসারা শাসনকর্তা। নির্দিষ্ট হারে কর দিতে চাইলেন খলিফাকে। তাই সন্ধি হলো তার সাথে।

আরবের উত্তর প্রান্ত ছোঁয়া সিরিয়াসহ বিশাল ভূ-খণ্ড নিয়েই রোমান সাম্রাজ্য। রোমানরা সিরিয়া দখল করে নিয়েছিলো। যা বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করে আরবদের।

রোমানরা চারিপাশের উপজাতিদের সব সময় ইসলামের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতো, ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো মুসলমানদের। শুধু তাই নয়, তারা আরব দেশ অধিকারের স্বপ্নও দেখেছিলো। এসব কারণে জরুরি হয়ে উঠলো রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান।

ছ'শ তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দের শেষদিক। খলিফা আবু বকর (রা.) মুসলিম সৈন্যদের তিনটি দলে ভাগ করলেন। তিনজন সেনাপতির নেতৃত্বে সৈন্য পাঠালেন, রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ সিরিয়ায়। সেনাপতি তিনজন হলেন আমর ইবনে আস (রা.), ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) ও আবু ওবায়দা (রা.)।

মুসলিম বাহিনী পৌঁছে গেলো, গন্তব্যের কাছাকাছি। দেখতে পেলো রোমানদের ব্যাপক রণ প্রস্তুতি। তখন কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হলো মুসলিম সৈন্যদের মনে। তাই থমকে দাঁড়ালেন তারা। পরামর্শ করলেন সবাই মিলে। খবর পাঠালেন মদীনায়, খলিফার কাছে। খলিফা সাথে সাথে নির্দেশ দিলেন ঃ 'তোমরা দৃঢ়তার সাথে ইয়ারমুকে সমবেত হও। আমি আরো সাহায্য পাঠাচ্ছি।'

ইয়ারমুক সিরিয়ার নিকটস্থ একটি মরুদ্যানের নাম। বড়ই মনোরম জায়গা। একদিকে পর্বত, অন্যদিকে নদী। এখানেই সমবেত হলো মুসলিম বাহিনী। ওদিকে খলিফার নির্দেশে ইরাক থেকে সসৈন্যে এসে পৌঁছালেন মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালীদ। চার সেনাপতির চার বাহিনী। সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো চল্লিশ হাজার। সেনাপতি হলেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)।

তেরো হিজরি। রজবের পাঁচ তারিখ। রণ নিনাদে ভারি হয়ে উঠলো ইয়ারমুকের বাতাস। উভয় পক্ষ ঝাঁপিয়ে পড়লো যুদ্ধের ময়দানে। শুরু হলো ভীষণ যুদ্ধ। দু'লাখ চল্লিশ হাজার রোমান সৈন্যের সাথে মাত্র চল্লিশ হাজার মুসলিম মুজাহিদের অসম সংঘর্ষ।

চলতে লাগলো আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ। বয়ে যাচ্ছে রক্তের স্রোত। মুসলিম বাহিনীর শাণিত তরবারির আঘাতে লুটিয়ে পড়ছে কাফিরদের লাশের পর লাশ। তবু তীব্রতর হচ্ছে রোমানদের আক্রমণ। সামাল সামাল লেগে যাচ্ছে মুসলিম বাহিনীরও। এমন সময় দূত এলো মদীনা থেকে। চমকে উঠলেন সবাই। সমস্বরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'কি ব্যাপার? সংবাদ ভাল তো?'

'হ্যাঁ, সংবাদ ভালো। মদীনা হতে আরো সৈন্য আসছে।' উত্তর দিলো দূত।

তারপর সংবাদ বাহক এগিয়ে গেলো সেনাপতি খালিদের দিকে। কি যেনো বললো কানে কানে, একখানা পত্রও দিলো হাতে। খালিদ পত্রখানা একবার পড়েই তুনের মধ্যে রাখলেন। তারপর যুদ্ধ করতে লাগলেন বীর বিক্রমে।

বেলা গড়িয়ে গেলো। খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে তীব্রবেগে আক্রমণ

করলেন। সে আক্রমণ আর সইতে পারলো না রোমকরা। অশ্বারোহী সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিলো। দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে লাগলো তারা। খালিদ এবার আক্রমণ করলেন পদাতিক বাহিনীকে। কচু কাটা হতে লাগলো এ বাহিনীর সৈন্যরাও।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। চরম পরাজয় হলো রোমানদের। নিহত হলো তাদের এক লক্ষ সৈন্য। রক্ত রঞ্জিত ইয়ারমুকের ময়দানে পত পত করে উড়তে লাগলো ইসলামের বিজয় পতাকা।

খালিদ এবার ময়দানের এক জায়গায় সমবেত করলেন তাঁর সৈন্যদের। করুণ কণ্ঠে শুনালেন খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত আবু বকরের (রা.) ইনতিকালের খবর। ক্ষণকাল পরে আনন্দের আবির দেখা দিলো তাঁর মুখে। হাসিমুখে জানালেন দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে হযরত ওমরের (রা.) দায়িত্ব গ্রহণ; আর সেই সাথে নিজের পদচ্যুতির সংবাদ।

খালিদ এবার খুলে ফেললেন তাঁর সেনাপতির পোশাক। হাসতে হাসতে পরিয়ে দিলেন তা হযরত আবু ওবায়দাকে (রা.)। তারপর গিয়ে দাঁড়ালেন সাধারণ সৈনিকের সারিতে।

## ষোলো

৬৩৪-এর ২২ আগস্ট। ইতিহাসের পালাবদলে রাজা, রাজ্য ও রাজ্য শাসনের পরিবর্তন হয়। নতুন রাজার কাছে এসে বদলিয়ে যায় যুগের নীতি, ভাবনা ও পরিকল্পনা। তাই ইসলামের ত্রাণকর্তা হযরত আবু বকরের (রা.) মৃত্যুর পর এলো হযরত ওমরের (রা.) শাসনকাল। নবীর (সা.) প্রিয় সাহাবীদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে খেলাফতের সুউচ্চ আসনে বসলেন তিনি। শুরু হলো ইতিহাসের আরেক গৌরবময় অধ্যায়। সুশাসন আর ভৌগোলিক সীমা সম্প্রসারণের যুগ। ইসলামী শাসনের আওতায় আসতে লাগলো একের পর এক অঞ্চল, দেশ, সাম্রাজ্য। এলো দুই পরাশক্তি, পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য। বিশ্ব মানচিত্রে ইসলামী শাসনের সীমা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো।

পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু হয়েছিলো খলিফা আবু বকরের সময়েই। কিন্তু সে অভিযানের সফলতা দেখে যেতে পারেননি মহান খলিফা। এই দুই বিশাল সাম্রাজ্যের সীমান্তে যখন যুদ্ধ চলছিলো, তখনই তাঁর পরপারের ডাক এলো। এজন্যেই খেলাফতের কন্টকাকীর্ণ আসনে বসেই হযরত ওমর (রা.) চাইলেন হযরত আবু বকরের (রা.) অসমাপ্ত কাজগুলো পূর্ণ করতে। নজর দিলেন সীমান্তের দিকে। ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যে যা একান্তই জরুরি।

খলিফা আবু বকরের সময়ে খালিদ ও মুসান্নার নেতৃত্বে পারস্য সীমান্তে অভিযান পাঠানো হয়েছিলো। তাতে ইরাকের বেশ কয়েকটি অঞ্চল মুসলমানদের হস্তগত হয়। বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলামের অধীনতা স্বীকার করেও নেয়। তখন সেনাপতি মুসান্না হীরায় অবস্থান করে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন; আর মহাবীর খালিদ খলিফার নির্দেশে গেলেন সিরিয়ায়।

এদিকে ভীষণ সমস্যায় পড়লেন মুসান্না। খালিদের অনুপস্থিতিতে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো পারসিকরা। নতুন সম্রাট ইয়াযদিজার্দ এর নির্দেশে একত্রিত হলো তারা। ইয়াযদিজার্দ শুধু হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে চাননি, আরব দেশ আক্রমণ করতেও সংকল্প করেন। খোরাসানের শাসনকর্তা রুস্তমকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন তিনি।

সেনাপতি মুসান্না হীরা থেকে বিতাড়িত হলেন। তখন খলিফার কাছে সাহায্যের আবেদন জানালেন তিনি। খলিফা ওমর (রা.) আবু ওবায়দাকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন। তারপর মুসান্নার সাহায্যে পাঠালেন তাঁকে। আবু ওবায়দা মুসলিম বাহিনী নিয়ে ইরাকের দিকে অগ্রসর হলেন। সেনাপতি মুসান্নাও অনুসরণ করলেন তাঁকে।

ওদিকে ব্যাপক সমর প্রস্তুতি নিলেন রুস্তম। গোটা সেনাবাহিনীকে দু'দলে ভাগ করলেন তিনি। তারপর মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের পাঠালেন, দু'দিকে। একদল সৈন্য ফোরাত নদী পার হয়ে হীরার দিকে অগ্রসর হলো। সেনাপতি মুসান্না ততোক্ষণে তাঁর বাহিনী নিয়ে নামারকে এসে গেছেন। মিলিত হয়েছেন আবু ওবায়দার সাথে।

এখানেই পারসিকদের সাথে তুমুল যুদ্ধ হলো মুসলিম বাহিনীর। শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো পারসিকরা।

পারসিক বাহিনীর দ্বিতীয় দলটি ফোরাত নদী অতিক্রম করে কাসকার দিকে এগিয়ে গেলো। সেনাপতি আবু ওবায়দা প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করলেন। পরাজিত হলো এ দলটিও

পারসিক বাহিনীর এই শোচনীয় পরাজয়ের খবর গেলো রুস্তমের কাছে। ভীষণ ক্ষিপ্ত হলেন তিনি। এই পরাজয়ের চরম প্রতিশোধ নিতে চাইলেন তিনি। বিপুল সৈন্য সমাবেশ করলেন ফোরাত নদীর তীরে। ওপারে প্রস্তুত মুসলিম বাহিনী। পশ্চিম তীরে। আর দেরী সয় না সেনাপতি আবু ওবায়দার (রা.)। নদী পার হতে চাইলেন তিনি। নিষেধ করলেন অভিজ্ঞ মুসান্না। কিন্তু শুনলেন না তাঁর কথা। নৌকা দিয়ে সেতু তৈরি করে পার হলেন সেই তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ ফোরাত নদী। তীব্রবেগে আক্রমণ করলেন পারসিকদের।

শুরু হলো ভীষণ যুদ্ধ। মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে যখন পারসিক বাহিনী প্রায় পরাজিত, তখনই শহীদ হলেন আবু ওবায়দা। হস্তির পদতলে পিষ্ট হয়ে। সেনাপতির মৃত্যুতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো মুসলিম বাহিনী। পারসিকদের আক্রমণও তীব্রতর হলো এ সময়। তাই আর টিকতে পারলো না মুসলিম সৈন্যরা। ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগলো তারা। প্রাণ বাঁচাতে চাইলো নদী পার হয়ে। কিন্তু মারা গেলো বেশির ভাগই। নদী সাঁতরে ওপরে উঠতে সক্ষম হলো মাত্র তিন হাজার সৈন্য।

মুসলিম বাহিনীর এ শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ এলো মদীনায়। খলিফার কাছে। যুগপৎ মর্মাহত ও উত্তেজিত হলেন খলিফা। তিনি চরম শিক্ষা দিতে চাইলেন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পারসিকদের। সৈন্য বাহিনী গঠন করলেন নতুন করে। সেনাপতি নিযুক্ত করলেন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে (রা.)। ওদিকে মুসান্নাও সৈন্য সংগ্রহ করলেন ইরাকের বিভিন্ন জায়গা থেকে। তিনি কূফার কাছে বুওয়ায়েব নামক স্থানে মিলিত হলেন মুসলিম বাহিনীর সাথে।

এ খবর গেলো পারস্য-সামরিক প্রধান রুস্তমের কানে। তিনিও বীর বিক্রমে মোকাবিলা করতে চাইলেন মুসলিমদের। পাঠালেন বারো হাজার সৈন্যের

এক বিশাল বাহিনী। মিহ্‌রানের নেতৃত্ব। ওদিক থেকে এগিয়ে এলো মুসলিমরা। মাঝখানে দীর্ঘ ফোরাত নদী। অপেক্ষামান দুই তীরে দুই বাহিনী।

এবার মুসলিম বাহিনী আর নদী পার হলো না। পার হলো পারসিকরা। মুসলিম বাহিনীও তৈরি ছিলো। বেঁধে গেলো তুমুল যুদ্ধ। বিরাট ভয়ঙ্কর সে লড়াই। তরবারিতে তরবারিতে যেনো আগুন ঝরছে। হতাহত হচ্ছে দু'পক্ষেরই। অকস্মাৎ শোনা গেলো এক উল্লাস ধ্বনি ঃ 'আমি মিহ্‌রানের মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি।'

সবাই দৃষ্টি দিলেন সেদিকে। দেখলেন আগালাগ গোত্রের এক নও জোয়ানকে। ছিন্ন মুণ্ড হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন তিনি। সাথে সাথে আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো মুসলিম সেনাদের বুকে। সমবেত কণ্ঠের 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে মুখরিত হলো বুওয়ায়বের রণক্ষেত্র, কেপে উঠলো পারসিকদের অন্তর। ভীত হয়ে পড়লো তারা।

মিহ্‌রান নিহত হবার পর নিস্তেজ হয়ে গেলো পারসিক বাহিনী। পালাতে শুরু করলো তারা। মুসলিম সেনাপতি মুসান্না ভেঙ্গে দিলেন শত্রু পক্ষের চলাচলের সেতু। ফলে আর পার হতে পারলো না তারা। আটকে পড়ে মরতে লাগলো মুসলিম সেনাদের হাতে। প্রাণ হারালো বিপুল সংখ্যক সৈন্য। চরম পরাজয় ঘটলো তাদের।

৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ। আবারও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন সম্রাট ইয়াযদিজার্দ। রাজধানী মাদাইনে তৈরি হলো এক লাখ বিশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী। দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে বাহিনী। 'বুয়ায়েবের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হবে, উদ্ধার করতে হবে রাজ্যের হারানো অংশ।' যুদ্ধের পরিচালক মহাবীর রুস্তম নিজেই।

ওদিকে মদীনার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলো খলিফা ওমরের (রা.) বার্তা। যুদ্ধে অংশ নেয়ার উদাত্ত আহ্বান। জনগণ ব্যাপক সাড়া দিলো সে আহ্বানে। মুসলিমরা দলে দলে এসে যোগ দিলো সেনাবাহিনীতে। মুসলিম সেনাপতি মুসান্না তখন আর বেঁচে নেই। তাই সাদ বিন আবী ওয়াককাসকে (রা.) সেনাপতি নিযুক্ত করলেন খলিফা। তারপর খলিফার নির্দেশে তাঁবু ফেলা হলো বিভিন্ন জায়গায়। মদীনা হতে ইরাক পর্যন্ত।

৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাস। সাদের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী কাদিসিয়ায় সমবেত হলো। তাঁবু খাটানো হলো এক উন্মুক্ত ময়দানে। যার সামনে পারস্যের উষর সমভূমি, পেছনে দাঁড়িয়ে আরব-পর্বতমালা।

যুদ্ধ শুরুর আগে সেনাপতি সাদ এক প্রতিনিধি দল পাঠালেন, পারস্যের রাজ দরবারে। সম্রাটকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানোর জন্যে। চৌদ্দজন বিশিষ্ট সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত এ দলের নেতা ছিলেন আসেম ইবনে উমর। দূতেরা পৌঁছে গেলেন শাহী প্রাসাদে। সম্রাট ইয়াযদিজার্দ তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা আমাদের দেশে কেনো এসছো?'

'তোমরা হয় ইসলাম কবুল করো, না হয় ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করো। যদি এ দু'টোর মধ্যে একটাও না করো, তবে আমাদের সাথে যুদ্ধ করো।' বললেন আসেম ইবনে উমর।

'দেখো আরববাসী! তোমরা ছিলে এক বর্বর জাতি। কিন্তু এখন তোমাদের এতো স্পর্ধা বেড়ে গেলো কিসে? কেন সাম্রাজ্যবাদের নেশা পেয়ে বসলো তোমাদের? শোনো, তোমরা এ নেশা ত্যাগ করো। ফিরে যাও নিজের দেশে। আমি তোমাদের অনেক পুরস্কার দেবো।'

'আমরা বর্বর জাতি ছিলাম– একথা ঠিক, তবে আমাদের মাঝে আল্লাহ পাঠিয়েছেন বিশ্বনবী (সা.)। যাঁকে পেয়ে আমরা এখন সভ্য ও শক্তিশালী এক জাতি। যে জাতির ভয়ে তোমাদের মতো পরাক্রমশালী সম্রাটও সন্ত্রস্ত। অতএব বেশি কথার প্রয়োজন নেই। হয় ইসলাম কবুল করো, না হয় বশ্যতা মেনে নাও। অন্যথায় তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ফয়সালা হবে তলোয়ারের মাধ্যমে।'

'কি বললে?' এতোদূর স্পর্ধা! রাষ্ট্রদূত হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ; তা না হলে আমি এই মুহূর্তে তোমাদের হত্যা করতাম। যাও মুসলিম, আমি রুস্তমকে পাঠাচ্ছি। সে তোমাদের কাদিসিয়ার মাটিতে কবর দেবে।'

মুসলিম দূতরা রুস্তমকেও ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। অস্বীকার

করলেন তিনিও। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বললেন, 'গোটা আরবের গর্ব আমি চূর্ণ করবো।'

৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ। মার্চ মাসের একদিন। মুখোমুখি দাঁড়ালো দুই বাহিনী। যুদ্ধ শুরু হলো যোহরের নামাযের পর। অসুস্থ ছিলেন মুসলিম সেনাপতি সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)। তবু যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন তিনি। একটি পুরোনো দালানের ছাদে বসে। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চললো। মুসলিম বাহিনী তেমন সুবিধা করতে পারলো না, বরং পাল্লা ভারি রইলো পারসিকদেরই।

পরদিন। ভোরবেলা। দাফন করা হলো শহীদের লাশ। আহতদের সেবার জন্যে দেয়া হলো মহিলাদের যিম্মায়। তারপর শুরু হলো যুদ্ধ। খলিফার নির্দেশে একদল সৈন্য এলো সিরিয়া হতে। ছ'হাজার সৈন্যের সে বাহিনী। এতে মুসলিম সৈন্যদের মনোবল আরো বেড়ে গেলো। তারা আক্রমণ চালাতে লাগলো প্রচণ্ড বেগে। তুমুল যুদ্ধ চললো সারাদিন। বেশ ভীত হয়ে পড়লো পারসিক বাহিনী।

তৃতীয় দিন। ভোরবেলা। শহীদের লাশ দাফন করার পর মুসলিম সেনারা আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন রণক্ষেত্রে। সারা দিন প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো। রাতেও থামলো না লড়াই। চললো তীব্রবেগে। সকাল হয়ে গেলো, তবু অবসান হলো না যুদ্ধের। তখন হুঙ্কার ছাড়লো পারস্য বাহিনীর এক বীর ঃ

'ভাই সব! তোমরা দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করো। আঘাত হানো প্রচণ্ড বেগে। জয় তোমাদের হবেই।'

হুঙ্কার শুনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মুসলিম যোদ্ধারা। ঘোড়া থেকে একযোগে লাফিয়ে পড়লেন সবাই। খোলা তরবারি হাতে ঢুকে পড়লেন শত্রু সৈন্যদের মধ্যে। গণ হারে কাটতে লাগলেন কাফিরদের। সেনাপতি রুস্তম তখনো সুউচ্চ আসনে বসা। যুদ্ধের এই শোচনীয় অবস্থায় আসন থেকে নামলেন তিনিও।

যুদ্ধ করতে লাগলেন বীরত্বের সাথে। কিন্তু মুসলিম বীরদের সাথে পেরে উঠলেন না। আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলো তাঁর যত্নের শরীর। শেষ

পর্যন্ত পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চাইলেন তিনি। দৌড় দিলেন আহত শরীর নিয়ে। তখন তাঁর পিছু ধাওয়া করলেন হেলাল ইবনে আলকামা। শক্তিশালী মুসলিম যোদ্ধা। অবস্থা বেগতিক দেখে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রুস্তম। সাথে সাথে হেলালও লাফিয়ে পড়লেন সেই পানিতে। এক ঝাঁপটায় উপরে তুললেন তাঁকে। তারপর দ্বিখণ্ডিত করলেন তরবারির আঘাতে।

সেনাপতি রুস্তমের মৃত্যুতে মনোবল একেবারেই হারিয়ে গেলো পারসিক সৈন্যদের। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে লাগলো তারাও। মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেলো ময়দান। চরম পরাজয়ের গ্লানি চেপে বসলো পারসিকদের ঘাড়ে। নিহত হলো তাদের ত্রিশ হাজার সৈন্য। আর মুসলিম বাহিনীর শহীদ হলেন আট হাজার মুজাহিদ।

ওদিকে দারুণ উদ্বিগ্ন খলিফা হয়রত ওমর (রা.)। প্রায় এক মাস কেটে গেলো। যুদ্ধের কোনো খবর পাচ্ছেন না তিনি। তাই প্রতিদিন সকাল হতেই মদীনার পথ পানে চেয়ে থাকেন তিনি। অপেক্ষা করেন কাদিসিয়া থেকে আসা কাসেদের জন্যে। দিনের পর দিন চলে যায়, সপ্তাহও পার হয়, এক এক করে। কেউ আসে না। তবু প্রতিদিনের প্রতিক্ষার শেষ হয় না তাঁর।

একদিন সত্যিই দেখতে পেলেন এক আগন্তুককে। উটের পিঠে খলিফার দিকেই এগিয়ে আসছে লোকটি। তখন খুশীর জোয়ার এলো হযরত ওমরের (রা.) বুকে। 'নিশ্চয় যুদ্ধের খবর নিয়ে দূত আসছে।' অপলক দৃষ্টিতে উট আরোহীর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। শিগ্‌গীরই কাছে এলো লোকটি। কিন্তু লোকটি একেবারে কাছে এলে খানিকটা হতাশ হলেন খলিফা। সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ। তবু সালাম বিনিময়ের পর খলিফা জিজ্ঞেস করলেন,

'হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

'কাদিসিয়া থেকে।'

'আমাকে সেখানকার খবর কিছু বলুন।'

'খবর ভালো। আল্লাহর হুকুমে মুসলমানরা জয়ী হয়েছেন।'

একথা বলেই শহরের দিকে দ্রুত উট চালিয়ে দিলো লোকটি। সে উট চালাচ্ছে আর চিৎকার করে বলছে ঃ

'ভাইসব! সু-সংবাদ শোনো। কাদিসিয়ার যুদ্ধে পারসিকরা পরাজিত হয়েছে। বিজয়ী হয়েছেন মুসলিমরা।'

উট আরোহীর পিছে পিছে খলিফাও দৌড় দিলেন। দৌড়াচ্ছেন আর যুদ্ধের খবর জিজ্ঞেস করছেন। এভাবে দু'জনেই পৌঁছে গেলেন শহরে।

লোকজন বেরিয়ে এলো পথে। খলিফাকে সালাম জানালো তারা। সম্বোধন করলো 'আমীরুল মোমেনীন' বলে। চমকে উঠলো সংবাদবাহক। তখনই বুঝতে পারলো ইনিই অর্ধ পৃথিবীর শাসক খলিফা হযরত ওমর (রা.)। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো সংবাদবাহক। সাথে সাথে উট থেকে নামলো সে। কম্পিত পায়ে এগিয়ে গেলো খলিফার দিকে। ভয় বিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ঃ

'হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি আগেই কেন আপনার পরিচয় দিলেন না?'

'তাতে কী হয়েছে।' হাসিমুখে বললেন খলিফা।

কাদিসিয়ার যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে মুসলিমরা। কিন্তু রাজধানী মাদায়েন তখনো অবিজিত। তাইগ্রীস নদীর তীরে অবস্থিত খুব সুন্দর ও সুরক্ষিত শহর এই মাদায়েন। এখানেই একত্রিত হয়েছে ছত্রভঙ্গ পারসিক সৈন্যরা। আবার যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে তারা। এই কারণে মাদায়েন দখল অনিবার্য হয়ে উঠলো। সাদ বিন আবী ওয়াককাসকে নির্দেশ দিলেন খলিফা।

৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ। মার্চ মাস। দূর হয়েছে যুদ্ধের ক্লান্তি। সুস্থ হয়ে উঠেছেন আহত সৈনিকরা। আবার রওয়ানা হলেন সাদ। মাদায়েনের উদ্দেশ্যে।

এদিকে মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করতে এগিয়ে এলো পারসিকরা। ফলে পথে খণ্ড যুদ্ধ হলো কয়েকটি। সেসব যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলো পারসিক সৈন্যরা।

এসব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনী পৌঁছে গেলো মাদায়েনের একেবার কাছাকাছি। তখনই সামনে পড়লো নদী। বিশাল তাইগ্রীসের

দু'কূল উপচে পড়া পানি। এই বিপুল জলরাশি পার হয়েই যেতে হবে ওপারে। জয় করতে হবে মাদায়েন। কিন্তু পারাপারের কোনো ব্যবস্থা নেই, নেই কোনো নৌকা, সেতু অথবা অন্য কোনো জলযান। তবু ভয় পেলেন না সত্যের সৈনিকরা। আল্লাহর নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ তাইগ্রীসের বুকে।

অপূর্ব দৃশ্য! পারসিকদের কানেও গেলো এ দুঃসাহসিক কাণ্ডের কথা। অনেকেই দূরে দাঁড়িয়ে দেখতেও পেলো। বিস্ময়ে হতবাক তারা। 'একী কাণ্ড! এরা কি মানুষ না অন্যকিছু!' কেঁপে উঠলো তাদের অবিশ্বাসী অন্তর। রাজধানী ছেড়ে পালাতে লাগলো তারা। আগেই পালালেন সম্রাট ইয়াযদিজার্দ। আশ্রয় নিলেন হালওয়ানে গিয়ে।

মুসলিম বাহিনী রাজধানীতে পৌঁছালো, কিন্তু শূন্য দেখলো শহর। কোনো মানুষ নেই, আছে শুধু পারস্য সম্রাটের সুউচ্চ শাহী প্রাসাদ। শ্বেত পাথরে নির্মিত সে প্রাসাদ। সেনাপতি সাদ সসৈন্যে ভেতরে ঢুকলেন। আদায় করলেন শোকরানার নামায। তারপর প্রাসাদের ছাদে টাংগিয়ে দিলেন ইসলামী পতাকা। উড়তে লাগলো তা পত পত করে।

মাদায়েনের পরাজিত পারসিকরা জালুলায় আশ্রয় নিলো। প্রস্তুতি দিলো যুদ্ধের জন্যে। আবারও। হালওয়ান হতে সম্রাট ইয়াযদিজার্দও সৈন্য পাঠালেন সেখানে।

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিলো পারসিকরা। পরিখা খনন করলো শহরের চারিদিকে, তার চারিপাশে দিলো কাঁটা তারের বেড়া। দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হলো সেই জালুলা শহর।

মুসলিম সেনাপতি সাদ তখনো অসুস্থ। তাই তিনি খলিফার নির্দেশে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন হাশেম ইবনে ওতবাকে। ষোল হিজরির সফর মাসে যাত্রা শুরু করলেন সাদ। বারো হাজার সৈন্য নিয়ে।

মুসলিম বাহিনী পৌঁছে গেলো জালুলায়, কিন্তু প্রবেশ করতে পারলো না শহরে। বাধ্য হয়ে শহর অবরোধ করে রাখতে হলো তাদের।

ওদিকে পারসিকদেরও সাহস হলো না সরাসরি আক্রমণে আসতে। তাই গেরিলা হামলার আশ্রয় নিলো তারা। তারা সুযোগ বুঝে শহর হতে বের হয়, আক্রমণ করে, আবার পালিয়ে যায়। এভাবে কেটে যায় অনেক দিন।

একদিন মুসলিম সৈন্যরা খুব সাহস নিয়ে ভেতরে ঢুকলো শহরের। শুরু করলো প্রবল বেগে ঝটিকা আক্রমণ। পারসিকরাও প্রাণপণে প্রতিরোধের চেষ্টা করলো, কিন্তু ব্যর্থ হলো। পরাজিত হয়ে পালাতে লাগলো তারা। মুসলিম বাহিনীও পলায়নরত সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করলো। ধরে ধরে কাটতে লাগলো তাদের।

বিজয়ী হলো মুসলিমরা। প্রচুর পরিমাণে মালে গণিমতও হস্তগত হলো মুসলিমদের। সাদ সেসব মালপত্র পাঠিয়ে দিলেন মদীনায়। খলিফার কাছে। রাশি রাশি সোনা, রূপা, মণি মুক্তা। সেই বিপুল ধন-সম্পদ দেখে কাঁদতে লাগলেন খলিফা। বিস্মিত হলো জনগণ। খলিফার কাছে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলো তারা ঃ

'হে আমীরুল মোমেনীন! এতো আনন্দের মাঝেও আপনি কাঁদছেন কেন?'

'আমি এই সম্পদের মধ্যে তোমাদের ধ্বংস দেখতে পাচ্ছি। কেননা, যে জাতির সম্পদের প্রাচুর্য আসে, সে জাতির মধ্যে বাসা বাঁধে হিংসা-বিদ্বেষ আর বিলাসিতা। শৌর্য-বীর্য লোপ পায় তার। তাই একদিন ধ্বংস হয়ে যায় সে জাতি।' কান্না জড়িত কণ্ঠে জবাব দিলেন খলিফা।

এদিকে নিরুপায় হয়ে সম্রাট ইয়াযদিজার্দ সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন খলিফার কাছে। খলিফাও সম্মত হলেন তাতে। স্বাক্ষরিত হলো সন্ধি চুক্তি। যা মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা নির্ধারণ করলো পারস্য পর্বতমালা পর্যন্ত। খলিফা এই সীমারেখা মেনে চলার জন্যে কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন মুসলিমদের। খলিফার নির্দেশ মেনে চললো মুসলিমরা। তাদের বাহিনীকে সীমাবদ্ধ রাখলো আরব ও ইরাকের মধ্যেই।

খলিফার নির্দেশে বিজিত ইরাকে সুশাসনের ব্যবস্থা করা হলো। রাজধানী স্থাপন (৬৩৮ খ্রি.) করা হলো কূফায়। একই সাথে বসরায়ও আর একটি সমৃদ্ধ নগরীর গোড়াপত্তন করা হলো।

ওদিকে রাজধানীও দু'টো সমৃদ্ধ অঞ্চল হারিয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন সম্রাট ইয়াযদিজার্দ। খাওয়া-ঘুম নেই তাঁর। দিন-রাত একই চিন্তা ঃ 'আবার যুদ্ধ করব আমি। প্রতিশোধ নেবো বার বার পরাজয়ের। নিশ্চিহ্ন হবে মুসলিমরা, ফিরে পাব রাজধানী ও হারানো সব অঞ্চল।'

তাই আবারও সৈন্য সংগ্রহ করলেন সম্রাট ইয়াযদিজার্দ। জুরজান, দামওযান্দ, রাই, ইস্পাহান ও হামাদান হতে। প্রস্তুত হলো এক লাখ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী।

পারসিকদের এই যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদে মদীনাতে দেখা দিলো দারুণ উত্তেজনা। সৈন্য সংগ্রহে মনোযোগ দিলেন খলিফা হযরত ওমর (রা.)। যোগাড় হলো ত্রিশ হাজার সৈন্য। নোমান বিন মুকারান হলেন সেনাপতি।

৬৪২ খ্রিস্টাব্দ। ইলবুর্জ পাহাড়ের পাদদেশে মুখোমুখি হলো পারসকি ও মুসলিম বাহিনী। বেধে গেলো ভীষণ যুদ্ধ। দারুণ রক্তক্ষয়ী সে সংঘর্ষ। পরাজিত হলো পারসিকরা। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলো তাদের শক্তি। পলায়ন করলেন সম্রাট ইয়াযদিজার্দ।

এরপর খলিফা পারস্যের বাকি অংশও দখলের নির্দেশ দিলেন। একেক জন সেনাপতিকে পাঠালেন একেক দিকে। তাঁরা জয় করতে লাগলেন একের পর এক অঞ্চল। মুসলিম অধিকারে এলো ফারস, কিরমান, মাকরান, সিজিস্তান, খোরাসান ও আজারবাইজান। এভাবে গোটা পারস্য সাম্রাজ্য করতলগত হলো মুসলিমদের।

আরব দেশের উত্তর-পশ্চিমে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশরের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ নিয়েই বিশাল রোমান সাম্রাজ্য। সিরিয়া এ সাম্রাজ্যের একটি সমৃদ্ধ প্রদেশ। আর এ প্রদেশের প্রবেশ দ্বার হচ্ছে দামেস্ক। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে এ প্রবেশ পথ অধিকার করলো মুসলিমরা। এ বিজয়ের ঘটনাটি এমনি ঃ

খলিফা আবু বকরের আমলে সিরিয়ায় চতুর্মুখী আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে দেয়া হয় প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব। খালিদ সিরিয়াবাসীদের বল-বিক্রম ও শান-শওকত সম্পর্কে ভালো করেই জানতেন। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অগ্রসর হলেন তিনি। চার

সেনাপতিকে পাঠালেন চারদিকে। আবু ওবায়দাকে হেমসে, ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে দামেশকে, শোরাহ্‌বীলকে জর্দানে এবং আমর ইবনে আসকে পাঠালেন ফিলিস্তিনে। আর নিজে আজনাদান হতে পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে দামেশকের দিকে ধাবিত হলেন। সময়মতো পৌঁছে গেলেন তিনি। বাবুশ শর্ক-এ এসে অবরোধ করলেন। অবরোধের তীব্রতা দেখে দারুণ হতাশ হলো দামেস্কবাসীরা। নিজেদের অনিবার্য পতন দেখতে পেলো তারা। তবু অপেক্ষা করতে লাগলো হেমস হতে হিরাক্লিয়াসের পাঠানো সৈন্যের জন্য। হিরাক্লিয়াস সৈন্য পাঠালেন ঠিকই, কিন্তু সে সৈন্যদের পথ আগলে দাঁড়ালো মুসলিম বাহিনী। এতে দামেশকবাসীর মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেলো। দিনের পর দিন অবরুদ্ধ অবস্থায় কাটতে হলো তাদের। এমনি সময় ঘটে গেলো এক ঘটনা ঃ

দামেশকের প্রধান ধর্মযাজকের জন্ম নিলো এক পুত্র। এতে খুশির জোয়ার বয়ে গেলো সারা শহরে। আয়োজন করা হলো এক আনন্দ উৎসবের। সেই আনন্দমুখর উৎসবে মদ খেলো সৈন্যরা। নেশা ধরে গেলো সবার। তারপর সন্ধ্যা হতেই ঘুমিয়ে পড়লো সব সৈন্যরা।

খালিদ এটাকে এক সুবর্ণ সুযোগ বলে মনে করলেন। তিনি একদল সাহসী যোদ্ধাসহ পরিখা পার হলেন। তারপর দড়ির সাহায্যে প্রাচীর অতিক্রম করলেন। অবশেষে রক্ষীদের হত্যা করে ঢুকে পড়লেন দুর্গের ভেতরে। এরপরই মুসলিম সৈন্যরা বন্যা স্রোতের মতো ঢুকতে লাগলো ভেতরে। এমন সময় হুঁশ হলো খ্রিস্টান সৈন্যদের। কিন্তু তখন আর উপায় নেই তাদের। নিরুপায় হয়ে নিজেরাই দুর্গের দরজা খুলে দিলো। আত্মসমর্পণ করলো মুসলিম বাহিনীর কাছে।

ইতোমধ্যে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের (রা.) মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় খলিফা হয়েছেন হযরত ওমর (রা.)। তিনি খালিদকে সেনাপতির পদ থেকে বহিষ্কার করলেন। তাঁর জায়গায় বসালেন আবু ওবায়দাকে। দামেশকবাসী সন্ধির প্রস্তাব করলো আবু ওবায়দার কাছে। আবু ওবায়দাও মেনে নিলেন তাদের শান্তি প্রস্তাব। স্বাক্ষরিত হলো সন্ধি চুক্তি। ইতোপূর্বে খালিদ

দামেশকের আরেক অংশও দখল করেছিলেন; কিন্তু সেনাপতি আবু ওবায়দা সন্ধি করায় তিনি আর এগুতে পারলেন না। সন্ধির শর্তানুযায়ী ফেরত দিলেন বিজিত অঞ্চল। সেই সাথে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যও।

দামেশক বিজয়ের পর জর্দানের দিকে অগ্রসর হলো মুসলিম বাহিনী। রোমান সৈন্যরা মুসলিম বাহিনীর এ অগ্রযাত্রা রোধ করতে চাইলো, সর্বশক্তি দিয়ে। সৈন্য সংগ্রহ করলো, সব জায়গা থেকে। সে সৈন্যরা সব সমবেত হলো জর্দানের বায়সান নামক স্থানে। ইতোমধ্যে রোম সম্রাটের পাঠানো সৈন্যরাও এসে গেলো। মুসলিম যোদ্ধারা আটকে রেখেছিলো তাদের। তখন রোমানদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো চল্লিশ হাজার।

মুসলিম বাহিনী ফাহাল নামক স্থানে সমবেত হলো। জানতে পারলো রোমানদের রণ প্রস্তুতির কথা। তাই সেখানে তাঁবু খাটালো তারা। তাদের সামনেই রইলো রোমানদের সৈন্য শিবির।

মুসলিম সৈন্যদের ভাব দেখে ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হলো রোমানদের মনে। যুদ্ধ করতে আর সাহস হলো না তাদের। তাই সন্ধির চেষ্টা করলো। দূত পাঠালো মুসলিম শিবিরে। দূত গিয়ে বললো ঃ

'আমরা যুদ্ধ চাইনা। সন্ধি চাই। আপনাদের সাথে আলোচনা করার জন্যে একজন দায়িত্বশীল লোককে আমাদের শিবিরে পাঠিয়ে দিন।'

সেনাপতি আবু ওবায়দা মুআয ইবনে জাবালকে (রা.) পাঠালেন। যিনি ছিলেন মহানবীর (সা.) এক বিশিষ্ট সাহাবী। যাঁর সততা, পরহেযগারিতা ও পূত-পবিত্র চরিত্রের খুব খ্যাতি ছিলো।

খ্রিস্টানরাও তাঁর সম্পর্কে জানতো। তাই এই মহান ব্যক্তির উপযুক্ত সম্মান দিতে চাইলো তারা। শিবিরের দরবার কক্ষে পাতালো রেশমী গালিচা। কিন্তু রোমানদের এই অর্থের অপচয় ও বিলাসিতা দেখে মুআয (রা.) ভীষণ বিরক্ত ও রুষ্ট হলেন। দরবার কক্ষে ঢুকলেন না তিনি। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লো রোমানরা। একজন সৈন্য ছুটে এসে বিনয়ের সাথে বললো ঃ

'আপনি ভেতরে আসুন, আমি আপনার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখছি।'

'না, গরীবের রক্ত চুষে তোমরা যে গালিচা তৈরি করেছো, আমি তাতে বসবো না।'

'সে কী! আমরা তো আপনার উপযুক্ত সম্মান দিতে চেয়েছি।'

'তোমরা যাকে সম্মান মনে করো, আমার তাতে কোনো প্রয়োজন নেই।' এই বলে মাটিতেই বসে পড়লেন মুআয (রা.)।

হযরত মুআযের নির্ভীকতা ও ন্যায় নিষ্ঠা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো রোমীয়রা। এরপর আর কোনো বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে সাহস হলো না তাদের। তবু এক সৈনিক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ

'বলুন তো মুসলিম বাহিনীতে আপনার মতো নির্ভীক ব্যক্তি আরো আছে কি?'

'আমার তো মনে হয় মুসলিম বাহিনীতে আমিই সবচে' নিকৃষ্ট ব্যক্তি।' জবাব দিলেন মুআয।

বেশিক্ষণ বসে থাকা অসহ্য লাগলো মুআযের। তাই যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। দোভাষীকে বললেন,

'ওদের বলো, আমার সাথে যদি কোনো কাজের কথা না থাকে, তবে আমি চলে যাই।'

এলো রোমান সামরিক প্রধান। প্রহরী বেষ্টিত হয়ে। পরনে দামী পোশাক তার। মুআযকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

'তোমরা এখানে কেন এসেছো? আবিসিনিয়া তো কাছেই ছিলো। সেখানে যেতে পারতে। পারস্যে গেলেও সুবিধা হতো। কিন্তু এসব বাদ দিয়ে এদেশে কেন এসেছো? তোমাদের জানা উচিত, আমাদের বাদশাহ খুব পরাক্রমশালী বাদশাহ', আর আমাদের সৈন্য সংখ্যা আকাশের নক্ষত্র ও ধরণীর বালুকা রাশির সাথে তুলনা করা যায়।'

সামরিক প্রধানের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন মুআয। হাসলেন তিনি মনে মনে। তারপর বললেন ঃ

'তোমাদের কাছে আমাদের প্রথম অনুরোধ– তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, নামায পড়ো, মদ্যপান ও শূকরের মাংস খাওয়া ত্যাগ করো। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করতে না চাও, তবে জিযিয়া দিয়ে সন্ধি করো। যদি দু'টোর কোনোটাই না করো, তবে তরবারির ফয়সালা মেনে নাও। আমরা অবিশ্বাসীদের সংখ্যাধিক্যের কোনো পরওয়া করিনা।'

'আমরা বলাকা ও জর্দানের যে অংশ তোমাদের রাজ্য-সীমান্তে অবস্থিত তা ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা এ দেশ ছেড়ে পারস্যে যাও।' আবারও প্রস্তাব করলো রোমান সামরিক প্রধান।

এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন মুআয। এরপর রোমান শিবিরে থাকা নিষ্প্রোজন মনে করলেন তিনি। তাই চলে আসলেন। শিবিরে এসে আবু ওবায়দাকে জানালেন সব কথা।

এরপর রোমানরা দূত পাঠালো সেনাপতি আবু ওবায়দার কাছে। দূত এসে খোঁজ দিতে লাগলো সেনাপতিকে। এক সৈনিককে জিজ্ঞেস করলো। সৈনিকটি মাটিতে বসে তীর ভাঁজ করতে থাকা আবু ওবায়দাকে দেখিয়ে দিলো। তার কথা বিশ্বাস হলো না রোমান দূতের। তার ধারণা– মুসলিম সেনাপতি থাকবেন অতি জাঁক জমকের সাথে। মাটিতে বসে তীর ভাঁজ করবেন কেন? সে সরাসরি আবু ওবায়দার কাছেই জিজ্ঞেস করলো ঃ

'সত্যিই আপনি কি মুসলিম সেনাপতি?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা আপনাদের প্রত্যেক সৈনিককে দু'টো করে স্বর্ণমুদ্রা দেবো। আপনারা এ দেশ ছেড়ে চলে যান।'

'অসম্ভব। আমাদের দু'টি শর্তের যে কোনো একটি মানতে হবে আপনাদের। তা না হলে যুদ্ধ অনিবার্য।' দৃঢ়তার সাথে বললেন আবু ওবায়দা।

খুব রাগান্বিত হয়ে চলে গেলো দূত। আবু ওবায়দা তার হাবভাব দেখে তখনি সৈনিকদের তৈরি হতে বললেন। তারপর সব কথা লিখে জানালেন খলিফা ওমরকে (রা.)।

পরের দিন। রোমান সেনাপতি তাঁর সৈন্যদের তিন দলে ভাগ করলেন। তারপর ময়দানে পাঠাতে লাগলেন এক এক করে। এলো প্রথম দলটি। তার মোকাবিলা করলেন কায়েস ইবনে হুবাইরা। তুমুল লড়াইয়ের পর পরাজিত হলো সে দল। এ যুদ্ধ শেষ না হতেই এলো দ্বিতীয় দল। একে পরাজিত করলেন সাবুরা ইবনে মাসরুক। এরপর রোমীয় সেনাপতি স্বয়ং এলেন তৃতীয় দল নিয়ে। ভীষণ যুদ্ধ হলো এ দলের সাথেও। বিজয়ী হলো মুসলিমরা। আর এ বিজয়ের ফলে সমগ্র জর্দান এলাকা মুসলিমদের অধিকারে এলো।

জর্দান অধিকারের পর হেমসের দিকে অগ্রসর হলো মুসলিম বাহিনী। হেমস্ সিরিয়ারই এক প্রাচীন শহর। সামান্য বাধার পর পদানত হলো এই শহর। সেনাপতি আবু ওবায়দা কিছু সৈন্য নিয়ে রয়ে গেলেন এখানে। জয় করলেন পার্শ্ববর্তী হোম, শিরাজ, মায়ারবাতুল প্রভৃতি স্থান। ইসলামের অধীনতা স্বীকার করলো এসব অঞ্চলের অধিবাসীরা।

উত্তর সিরিয়ার এন্তাকিয়া। রোম সম্রাটের অস্থায়ী রাজ প্রাসাদ। সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাট হিরাক্লিয়াস। সামনে বসা বিশিষ্ট সভাসদরা। ভীষণ উত্তেজিত হিরাক্লিয়াস। রাগান্বিত স্বরে বলতে লাগলেন ঃ

'একের পর এক পরাজয় হচ্ছে আমার। মুসলিমদের অধিকারে যাচ্ছে এলাকার পর এলাকা। গেলো দামেশক, জর্দান, হেমস্–এসব গুরুত্বপূর্ণ শহর। অথচ রোমান সৈন্যরা কিছুই করতে পারছে না ওই মুসলিমদের। আশ্চর্য।'

কথাগুলো বলেই চুপ করলেন হিরাক্লিয়াস। ক্ষণকাল পরে স্বর অনেকটা নরম করে সভাসদদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'আরবরা শক্তি, সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্র– সবদিক দিয়েই তোমাদের চেয়ে দুর্বল। তবে তোমরা কেন তাদের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারছো না? বলো, জবাব দাও।' ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলো সভাসদরা। কেউ কোনো জবাব দিতে পারলো না। মাথা নিচু করে বসে রইলো সবাই। এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্যক্তি উঠে বললো ঃ

'জাঁহাপনা! এর পেছনে কিছু কারণ আছে।'

'কি কারণ? বলো।'

'জাঁহাপনা! আরবদের চরিত্র আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত। তারা দিনে রোযা রাখে, রাতে এক আল্লাহর ইবাদত করে। কেউ কারো প্রতি অত্যাচার করে না, সবাই মিলে মিশে থাকে। কিন্তু আমাদের চরিত্র অত্যন্ত কুলষিত। আমরা মদ খাই, ব্যভিচারে লিপ্ত থাকি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি। এসব কারণে আমাদের প্রতিটি কাজেই শক্তি ও সাহসের অভাব থাকে।'

হিরাক্লিয়াস বৃদ্ধের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। বুঝলেন, আরবদের জয়ের উৎস কোথায়। তাই এমন উন্নত জাতির সাথে আর যুদ্ধ করতে সাহস হলো না তাঁর। গোপনে সিরিয়া ত্যাগ করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু পারলেন না। খ্রিস্টান পুরোহিতরা এসে ঘিরে ধরলো তাঁকে। যুদ্ধ করার জন্যে বার বার অনুরোধ করতে লাগলো তারা। উভয় সংকটে পড়ে গেলেন সম্রাট হিরাক্লিয়াস।

ওদিকে ফিলিস্তিন বিজয়ের ভার ছিলো আমর ইবনে আসের ওপর। ষোলো হিজরিতে রওয়ানা হলেন তিনি। তোনা বালস্ লূদ, আমওয়াস, বাইতে, জিরীন প্রভৃতি ফিলিস্তিন প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। আমর একটি একটি করে দখল করলেন এগুলো। তারপর অবরোধ করলেন 'বায়তুল মোকাদ্দাস'। খ্রিস্টানরা দুর্গে আশ্রয় নিলো। যুদ্ধ করতে লাগলো সেখান থেকে। ইতোমধ্যে আবু ওবায়দা সিরিয়া হতে বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছালেন। এতে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো খ্রিস্টানরা। সন্ধির প্রস্তাব করলো তারা। সেই সাথে আরোপ করলো একটি শর্ত ঃ 'আমরা সন্ধি করতে পারি, যদি খলিফা নিজে এসে সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন।'

তখন আবু ওবায়দা হযরত ওমরকে লিখলেন ঃ 'বায়তুল মোকাদ্দাসের বিজয় নির্ভর করছে আপনার আগমনের ওপর।'

পত্র পেয়ে খলিফা ওমর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বসলেন। মতামত চাইলেন সবার কাছে। হযরত ওসমান বললেন, 'খ্রিস্টানরা এখন ভীত হয়ে পড়েছে; আপনি না গেলেও আত্মসমর্পণ করবে তারা।' হযরত আলী যাবার পক্ষেই

মত দিলেন। খলিফা তাঁর মতই গ্রহণ করলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন জেরুজালেমে যাবার।

ষোলো হিজরি। রজব মাস। হযরত আলীকে (রা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন খলিফা। সঙ্গে নিলেন একজন ভৃত্য, আর খাদ্য সামগ্রী হিসেবে নিলেন কিছু খোরমা ও কয়েকটি রুটি। তারপর রওয়ানা হলেন জেরুজালেমের উদ্দেশে।

বালুময় উত্তপ্ত মরুভূমি। তার ওপর প্রকৃতির লু-হাওয়া। জনমানবহীন প্রান্তর। বিপদ সংকুল পথ। চলেছেন অর্ধ পৃথিবীর শাসক হযরত ওমর (রা.)। একজন মাত্র ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর অন্তরে আল্লাহর ছাড়া আর কারো ভয় নেই, নেই কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। আছে শুধু শান্তির অনির্বাণ আশা।

কিছুদূর গিয়ে উট থেকে নামলেন তিনি। বসতে বললেন ভৃত্যকে। ভৃত্য সবিনয়ে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে চাইলো। কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো ঃ

'হে আমীরুল মোমেনীন! এ কেমন আদেশ আপনার? ভৃত্য বসে যাবে উটের পিঠে আর খলিফা ওমর (রা.) ধরে যাবে সে উটের রশি?'

'নিশ্চয়ই। কারণ আমি তো খলিফা, মানুষের একজন সেবক মাত্র।'

ভৃত্যকে উঠতে হলো সেই উটের পিঠে। আর খলিফা ওমর চললেন উটের রশি হাতে। কিছুদূর গিয়ে তিনি বসলেন উটের পিঠে, আর ভৃত্য চললো রশি ধরে। এভাবে পালাক্রমে উঠতে উঠতে এক সময় তাঁরা পৌঁছে গেলেন জেরুজালেমের নগর দ্বারে। তখন ভৃত্য ছিলো উঠের পিঠে বসা, আর খলিফা পদব্রজে। খ্রিস্টানরা উট আরোহী গোলামকেই খলিফা মনে করলো। স্বাগত জানাতে লাগলো তারে, বার বার। তখন সেনাপতি আবু ওবায়দা ভুল ভেঙ্গে দিলেন তাদের। বললেন, 'উটের পিঠে বসা ব্যক্তি খলিফা নয়, যিনি রশি ধরে টানছেন, তিনিই খলিফা।'

বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হলো খ্রিস্টানরা। তারা এগিয়ে এসে স্বাগত জানালো খলিফাকে। তারপর লেখা হলো সেই সন্ধিপত্র। যাতে উল্লেখ ছিলো ঃ

খ্রিস্টানদের গীর্জা বা উপাসনালয়ের কোনো ক্ষতি করা হবে না। ইসলাম ধর্ম

তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে না। অন্যান্য বিজিত স্থানের মতো জেরুজালেমের অধিবাসীরাও জিযিয়া কর প্রদান করে শান্তিতে বসবাস করবে। গ্রীকদের তারা শহর থেকে বের করে দেবে, কিন্তু কোনো গ্রীক শহর ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে না পৌছানো পর্যন্ত তার জান মালের হেফাযত করতে হবে। যারা গ্রীকদের সাথে চলে যেতে চাইবে, তাদের জান মাল, গীর্জা ও ক্রসের হেফাযত করা হবে। পুরুষ পরম্পরায় এ সন্ধির শর্ত মেনে চলবে মুসলমানরা। খলিফা এই চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করলেন।

৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের শেষদিক। খলিফার অনুমতি নিয়ে আমর বিন আস রওয়ানা হলেন মিশরের দিকে। সৈন্য নিলেন মাত্র চার হাজার।

ফারমা। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী সুন্দর ও সমৃদ্ধ এক নগরী। আমর অবরোধ করলেন এই নগরী। একমাস পর আত্মসমর্পণ করলো নগরবাসীরা।

এরপর আমর ফুসতাতে উপস্থিত হলেন। ফুসতাত নীলনদ ও মাক্তম পর্বতের মধ্যবর্তী এক সবুজ শ্যামল জনপদ। এখানে ছিলো এক সুরক্ষিত দুর্গ। এক উন্মুক্ত ময়দানে শিবির স্থাপন করলেন আমর। তারপর সাহায্য প্রার্থনা করে দূত পাঠালেন মদীনায়। সাথে সাথে জুবায়ের বিন আওয়ামের নেতৃত্বে ছ'হাজার সৈন্য পাঠালেন খলিফা। ফলে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো দশ হাজার। অন্যদিকে প্রতিপক্ষের সৈন্য হলো পঁচিশ হাজার। আক্রমণ চালালো মুসলিম বাহিনী। প্রথম আঘাতেই আত্মসমর্পণ করলো রোমকরা। তাদের শাসনকর্তা সাইরাস আশ্রয় নিলেন ব্যাবিলন দুর্গে; আর সেনাপতি থিওডোরাস পালিয়ে গেলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়।

ফুসতাত বিজয়ের পর রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় হাজির হলেন আমর। আক্রমণ করলেন শহর। সাইরাসও পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। কয়েক মাস কেটে গেলো। তবু বিজিত হলো না আলেকজান্দ্রিয়া। ওদিকে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো খলিফা ওমরের। তিনি পত্র দিয়ে ভর্ৎসনা করলেন আমরকে ঃ

'অনেক দিন মিশরের বিলাস-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছো তোমরা। তা না হলে আজও যুদ্ধে জয় হলো না কেন?' পত্র পড়ে ভীষণ

লজ্জিত হলেন আমর। সৈন্যদের এক জায়গায় সমবেত করলেন তিনি। দিলেন এক উগ্র বক্তৃতা। তারপর প্রচণ্ড বেগে আঘাত হানলেন শত্রুদের। সে আক্রমণ আর ব্যর্থ হলো না। পরাজিত হলো রোমকরা। মুসলিমদের করতলগত হলো মিশর।

মসজিদে নববীতে ফজরের নামাযে দাঁড়িয়েছেন সাহাবীরা। ইমামতীর দায়িত্বে আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.)। নামায শুরু হয়েছে, এমন সময় সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে থাকা আবু লুলু তার আস্তিনের ভেতর থেকে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করে খলিফাকে। ক্ষতস্থান চেপে ধরে পিছনে এলেন খলিফা। ধরাধরি করে তাঁকে বাড়ি নিয়ে এলেন সাহাবারা। সেদিন নামাযের ইমামতী করলেন হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ।

দুই দিন এক রাত্রি পর তিনি পরপারের পথে পাড়ি জমালেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। শেষ হলো এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের।

## সতেরো

হযরত ওসমান (রা.) খেলাফতের আসনে বসলেন (৬৪৪–৬৫৬ খ্রি.)। তাঁর এই খেলাফতকালীন সময়ের প্রথম ছ'বছর ইসলামের বিজয় ছিলো মহিমায় উজ্জ্বল। হযরত ওমরের মৃত্যুর পর পারস্যে এক বিদ্রোহের সূচনা হয়। সে সময় পারস্যের দায়িত্ব ছিলো আবু মূসা আশআরীর (রা.) ওপর। খলিফা তাঁকে শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করে আব্দুল্লাহ বিন আমীরকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। নতুন শাসনকর্তা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের সাথে সে বিদ্রোহ দমন করেন। পরাজিত পারস্য সম্রাট ইয়াযদিজার্দ খোরাসানে আশ্রয় নিলে তরুণ শাসক আব্দুল্লাহ তাঁর বাহিনীকে খোরাসানের দিকে পরিচালিত করেন এবং যুদ্ধে খোরাসান দখল করে নেন। তিনি খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে পৌছান। তিনি বখল, তুর্কীস্তান, হিরাত, কাবুল ও গজনী দখল করে ইসলামের বিজয় পতাকা ভারতবর্ষের সীমানা পর্যন্ত উড্ডীন রাখেন।

হযরত ওমরের মৃত্যুর পরপরই পশ্চিম অঞ্চলেও গোলযোগ শুরু হয়।

হযরত ওসমান (রা.) মিশরের শাসনকর্তা আমর বিন আসকে অপসারণ করে তাঁর পালিত ভাই আব্দুল্লাহ বিন সাদকে নিয়োগ করেন। সাদ সেনা বাহিনী নিয়ে উত্তর আফ্রিকার ত্রিপলী ও বারাকা পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং কার্থেজে উপনীত হন। সেখানকার শাসনকর্তা গ্রেগরীর সাথে তুমুল যুদ্ধ হলে রোমান বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। গ্রেগরীও নিহত হন। এভাবে আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে।

হযরত ওসমানের (রা.) খেলাফতকালের প্রথম ছ'বছর যে রাজ্য জয় হয়েছিলো তাতে ইসলামের সীমা পশ্চিমে ইউরোপ এবং পূর্বে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমানায় দাঁড়িয়ে ছিলো। তাঁর খেলাফতের বাকি ছ'বছর ইসলামের কলঙ্কজনক অধ্যায়। অনেকে হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে। সেগুলো হলো ঃ

১. খলিফা নিজ আত্মীয়-স্বজনকে উচ্চ পদের দায়িত্বে নিয়োগ করেন।

২. তিনি আবু যর গিফফারীর মতো সাহাবাদের অপদস্ত করেন।

৩. কুরআন শরিফের কপি পুড়িয়ে দেন।

৪. আত্মীয়-স্বজনদের বায়তুল মাল থেকে অর্থ প্রদান করেন।

এ সমস্ত অভিযোগের কারনে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি বিদ্রোহীদের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এমনকি বিদ্রোহীরা আশ্বস্ত হয়ে ফিরেও যাচ্ছিল। কিন্তু পথে খলিফার সীলমোহর অঙ্কিত মারওয়ানের একটি চিঠি পড়ে বিদ্রোহীদের হাতে। তাতে লেখা ছিলো ঃ বিদ্রোহীরা স্ব স্ব স্থানে পৌঁছানোর সাথে সাথে যেন তাদেরকে হত্যা করা হয়। এতে বিদ্রোহীরা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফিরে এসে বাসগৃহ ঘেরাও করে খলিফার। দু'জন বিদ্রোহী আরো উত্তেজিত হয়ে পাচিল টপকিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। খলিফা তখন কুরআন শরিফ পাঠরত অবস্থায় ছিলেন। এ সময় নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করে তারা।

হযরত ওসমানের (রা.) মৃত্যুর পর খেলাফতে আসীন হলেন (৬৫৬ খ্রি.) হযরত আলী (রা.)। তখন চারিদিকে জ্বলছিলো বিদ্রোহের আগুন। যা খুব

দ্রুত ভয়াবহ হয়ে উঠলো, ফাটল ধরালো ইসলামের ঐক্য ও সংহতির মূলে। শুরু হলো আত্মঘাতী সংঘর্ষ। আর তা স্থায়ী হলো প্রায় অর্ধশত বছর।

শুরুতেই তালহা ও যুবাইর খলিফার কাছে ওসমানের হত্যাকারীদের শাস্তি দাবি করলেন। খলিফা আলী তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানালেন, তারা খলিফার বিরুদ্ধে গেলেন, বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। তারপর সৈন্য সংগ্রহ করার জন্যে বসরার দিকে এগিয়ে গেলেন। উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাও (রা.) বৃদ্ধ খলিফা হযরত ওসমানের (রা.) হত্যায় দারুণ মর্মাহত হয়েছিলেন। তাই তিনি গেলেন তালহা ও যুবাইরের পক্ষে।

যুদ্ধের জন্যে তৈরি হলো বিদ্রোহীরা। অবস্থা দেখে দারুণ মর্মাহত হলেন হযরত আলী (রা.)। আসন্ন যুদ্ধ এড়াতে শান্তির প্রস্তাব দিলেন তিনি। কিন্তু এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো আলীর সমর্থকরা। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তারা তালহা ও যুবাইরের সৈন্যদের ওপর হামলা করলো। আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়ে তালহা ও যুবাইরের বাহিনীও প্রতি আক্রমণ করলো। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। যুদ্ধের অবস্থা যখন তুঙ্গে, তখন খলিফা আবারও শান্তির প্রস্তাব দিলেন। সম্মত হলেন তালহা ও যুবাইর। আসলে তাঁরা কেউই মনে প্রাণে যুদ্ধ চাননি। কেবল বিদ্রোহীদের চাপে পড়ে এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা।

যুদ্ধক্ষেত্র হতে চলে এলেন তালহা ও যুবাইর। কিন্তু বেঁচে থাকতে পারলেন না বেশিক্ষণ। পথিমধ্যে শহীদ হলেন বিদ্রোহীদের হাতে।

তালহা ও যুবাইরের মৃত্যুর পরও তাঁদের সৈন্যরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। হযরত আয়েশা (রা.) উটের পিঠে বসে সে যুদ্ধ পরিদর্শন করছিলেন। এই জন্যে এ যুদ্ধ উটের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো আলীর পক্ষ। খলিফা যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে হযরত আয়েশাকে (রা.) পাঠিয়ে দিলেন মদীনায়। তাঁর ভাইদের কাছে। এভাবে শেষ হলো উটের যুদ্ধ।

যুদ্ধের পর হযরত আলী প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আনলেন ব্যাপক পরিবর্তন। বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্রোহ সমূলে ধ্বংস করার জন্যে শাসনকর্তাদের রদ বদল

করলেন। কায়েস বিন সাদকে মিশরে, সাহল বিন হানিফাকে হিজাযে এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে বসরায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হলো। মদীনা হতে কূফায় রাজধানী স্থানান্তর করা (৬৫৭ খ্রি.) হলো।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন সিরিয়ার শাসনকর্তা। আগে থেকেই খলিফার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো ছিলো না। এ সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে ওসমান (রা.) হত্যার পরে। ওসমান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন তিনি। হযরত আলী (রা.) ইসলামের স্বার্থে মুয়াবিয়াকে তাঁর অনুগত হবার আহ্বান জানালেন। কিন্তু তিনি তাতে সাড়া না দিয়ে বিরোধিতা করেই চলতেন। ফলে খফিলার সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠলো তাঁর।

৬৫৭-এর জুলাই মাস। খলিফা হযরত আলী পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। মুয়াবিয়া এ সংবাদ পেয়ে ষাট হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে আলীর বিরুদ্ধে ধাবিত হলেন। ইউফ্রেতিস নদীর পশ্চিম তীরের সিফফিন নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো এবং তা চলতে লাগলো কয়েক দিন ধরে। শেষ দিনে মুয়াবিয়ার বাহিনী যখন প্রায় পরাজিত, তখন তাঁর সেনাপতি আমর বিন আসের পরামর্শে এক নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন মুয়াবিয়া। সৈন্যদের বললেন, বর্শাগ্রে কুরআন শরিফ ঝুলিয়ে চিৎকার করে বলতে ঃ

'এখানে আল্লাহর কেতাব। এটা আমাদের মধ্যে বিরোধ ফয়সালা করবে।'

তাই করলো সৈন্যরা। আলীর সেনাবাহিনীতে ছিলেন অনেক হাফেজে কুরআন। তারা প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন এবং বললেন, 'আল্লাহর আইনের মাধ্যমে এই বিরোধ মীমাংসা করতে হবে।' ফলে হযরত আলী স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

এরপর 'দুমাতুল জন্দল' নামক স্থানে সালিসীর আয়োজন করা হলো। কিন্তু এ সালিসীর বিরোধিতা করলো এক শ্রেণীর বিশিষ্ট লোক। তারা সংখ্যায় ছিলো বারো হাজার। আলীর দল ছেড়ে চলে গেলো তারা। পরিচিত হলো 'খারেজী' নামে।

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে সালিস শুরু হলো। দু'পক্ষের দু'জন প্রতিনিধি নিযুক্ত হলেন। কিন্তু প্রতিনিধিদ্বয় আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কে খলিফা হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করলেন। দু'জনকেই পদচ্যুত করলেন তারা। এতে আলীই ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। কেননা তিনি ছিলেন কর্মরত খলিফা, আর মুয়াবিয়া তাঁরই অধীনস্থ শাসনকর্তা। মুয়াবিয়ার পদচ্যুতির জন্যে কোনো খেলাফত ছিলো না।

সালিসীর এ রায় এক শ্রেণীর লোককে ভীষণ ক্ষিপ্ত করে তুললো। তারা দেশব্যাপী ছড়াতে লাগলো বিদ্রোহের আগুন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে হযরত আলী সন্ধি করার সিদ্ধান্ত নিলেন মুয়াবিয়ার সাথে। স্থির হলো, সিরিয়া ও মিশর মুয়াবিয়ার শাসনাধীন থাকবে, আর সাম্রাজ্যের বাকি অংশের শাসক থাকবেন আলী। এভাবে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভক্তির মাধ্যমে আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি হলো।

খারেজীদের মতে, আলী ও মুয়াবিয়া কেউ খলিফা হবার যোগ্য নয়। তাই তাঁদেরকে হত্যা করা উচিত। সেই সাথে আমর বিন আসকেও। তৈরি হলো খারেজীদের তিনজন– আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম, বার্ক ইবনে আব্দুল্লাহ এবং আমর ইবনে বকর।

৪০ হিজরির ১৭ রমযান। ফজরের নামাযের সময় তিন আততায়ী হামলা করলো তিনজনের ওপর।

আমর ইবনে আসের পরিবর্তে সে দিন নামায পড়াতে এসেছিলেন অন্য একজন। সেই ভ্রান্তিতে শহীদ হলেন তিনি। মুয়াবিয়ার ওপর আঘাত তেমন গুরুতর ছিলো না। তাই সামান্য চিকিৎসার পরই সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু আলীর জখম ছিলো খুবই মারাত্মক। কোনো চিকিৎসায়ই কাজ হলো না। আহত হবার তিনদিন পর– ৪০ হিজরির ২০ রমযান শহীদ হলেন তিনি।

হযরত আলীর (রা.) ইনতিকারের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম হাসান কূফাবাসীদের সাহায্যে পিতার আওতাভুক্ত অঞ্চলের খলিফা হলেন। মক্কা ও মদীনার অধিবাসীরাও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এ সংবাদ

মুয়াবিয়ার কানে পৌঁছা মাত্র তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। মুয়াবিয়ার সুসংঘবদ্ধ বাহিনীর মোকাবিলা করতে অসমর্থ হয়ে এবং কূফাবাসীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করলেন হাসান। সন্ধির শর্তানুযায়ী ইমাম হাসান (রা.) মুয়াবিয়াকে তাঁর জীবদ্দশায় খলিফা বলে স্বীকার করে নিলেন। মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর খেলাফত লাভ করবেন আলীর দ্বিতীয় পুত্র ইমাম হোসাইন।

৬৬১-এর ৩০ জুলাই খেলাফতের আসনে বসলেন মুয়াবিয়া (রা.)। শাসক বংশ ও শাসননীতির আমূল পরিবর্তন এলো। ইসলামী সমাজে উমাইয়া বংশের শাসন কায়েম হলো, অবলুপ্ত হলো খোলাফায়ে রাশেদীনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, সূচনা হলো বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের।

সিংহাসনে বসেই সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানে আত্মনিয়োগ করলেন মুয়াবিয়া। হযরত ওসমানের (রা.) মৃত্যুর পর থেকে দেশব্যাপী যে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিলো তা দ্রুত দমন করলেন। খর্ব হলো খারেজী, হিমারীয় ও মুদারীয়দের ক্ষমতা। কূফা হতে রাজধানী নিয়ে এলেন দামেশকে। তারপর রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করলেন তিনি। ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকায়।

উত্তর আফ্রিকায় তখন বাস করতো দুর্ধর্ষ ও দুর্দমনীয় বার্বার জাতি। হিংস্র স্বাধীনতা প্রিয়তায় উদ্দীপিত তারা। তাদের সহযোগিতায় রোমকরা দখল করে নিয়েছিলো খলিফা ওসমানের অধিকৃত অঞ্চল। মুয়াবিয়া ওকবা বিন নাফিকে পাঠালেন উত্তর আফ্রিকায়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করেন রোমান ও বার্বারদের বিরুদ্ধে। অধিকারে আনেন সেই অশান্ত উত্তর আফ্রিকা।

৬৭০ খ্রিস্টাব্দে ওকবা এখানে কায়রোয়ান নামে একটি সুন্দর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ৬৭৫-এ তিনি অগ্রসর হলেন আরো পশ্চিমে। রোমান ও গ্রীকরা বাধা হয়ে দাঁড়ালো তাঁর সামনে। তবু বলপূর্বক তাদের সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। পৌঁছালেন আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে। কিন্তু বিশাল জলরাশি হতাশ করলো তাঁকে। থেমে গেলো তাঁর দ্রুতগামী অশ্ব। তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে চিৎকার করে বলে উঠলেন ঃ

'হে আল্লাহ! যদি এই বিশাল জলরাশি না থাকতো, তবে আমি আরো দূরে এগিয়ে যেতাম, প্রচার করতাম তোমার নামের মহিমা।'

পূর্ব দিকের বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রেও মুয়াবিয়ার অবদান অপরিসীম। দায়িত্ব দেয়া হয় মুহাল্লিব বিন আবু সুফরাকে। প্রথমে তিনি হিরাতের বিদ্রোহ দমন করেন। এতে তাঁর সময় লাগে দু'বছর। তারপর গজনী, কান্দাহার, সমরকন্দ ও তিরমিজও বিজিত হয়।

৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়া একটি শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটান। তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে মনোনীত করেন তাঁর উত্তরাধিকারী। ফলে খলিফা নির্বাচনের প্রজাতান্ত্রিক পদ্ধতি লুপ্ত হয়, সূচনা হয় বংশগত রাজতন্ত্রের। ৬৮০-তে ইনতিকাল করেন মুয়াবিয়া (রা.)।

মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন তাঁর পুত্র ইয়াযীদ। সে ছিলো অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অযোগ্য ও অবিবেচক। এই কারণে তার রাজমুকুট পরার তীব্র বিরোধিতা করলেন খেলাফতের অন্যতম দাবিদার, হযরত আলীর (রা.) দ্বিতীয় পুত্র হযরত হোসাইন (রা.)। দূরাচার ইয়াযীদের মনোনয়নের ব্যাপারে মক্কা ও মদীনার লোকেরা আগে থেকেই বিরোধী ছিলো; এখন ইয়াযীদের ইরাকের শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের অত্যাচারে কূফাবাসীরাও বিদ্রোহ করলো। তারা হোসাইনকে কূফায় যাবার আমন্ত্রণ জানালো। সাহায্যের আশ্বাসও দিলো। হোসাইন স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সপরিবারে কূফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ফোরাত নদীর তীর ধরে এগিয়ে চলেন তিনি। এদিকে ওবায়দুল্লাহ তাঁর গতি রোধ করার জন্য ওমর বিন সাদকে চার হাজার সৈন্যসহ পাঠালো।

৬৮০-এর ১০ অক্টোবর কারবালা প্রান্তরে হোসাইন (রা.) ইয়াযীদ বাহিনীর মুখোমুখি হলেন। ইয়াযীদের সৈন্যরা সপরিবারে ঘেরাও করলো তাঁকে। বন্ধ করে দিলো ফোরাত নদীর পানি। নিরুপায় হয়ে স্বল্প সংখ্যক পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিশাল ইয়াযীদ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন তিনি। কিন্তু পেরে উঠলেন না এই অসম যুদ্ধে। এক এক করে শহীদ হলেন সবাই। শিশু, কিশোর, যুবক– সবাই। পুরুষদের মধ্যে একমাত্র জয়নুল আবেদীন ছাড়া আর কেউ বেঁচে রইলো না।

দীর্ঘ তিন বছর ধরে চললো ইয়াযীদের এ দুঃশাসন। ৬৮৩-তে মৃত্যু হলো তাঁর। ইয়াযীদের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন তার পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়া। কিন্তু কয়েক মাস পরে মৃত্যু হলো তাঁর।

দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার কোনো পুত্র না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর আমীরগণ সিংহাসনে বসালেন মারওয়ান বিন হাকামকে (৬৮৪ খ্রি.)। এ সময় উমাইয়া খেলাফত চরম সংকট সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করছিলো। একদিকে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর খলিফা হিসেবে সিরিয়া ও মিশরে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করলেন, অন্যদিকে খারেজীরা করলো বিদ্রোহ। তারা মধ্য আরবে প্রতিষ্ঠা করলো খারেজী রাষ্ট্র। মারওয়ান এ সবের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। অল্প সময়ের মধ্যে অবসান ঘটালেন সব বিদ্রোহ ও অরাজকতার। ৬৮৫-তে নির্মমভাবে নিহত হলেন তিনি। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্র আব্দুল মালিক কে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

সিংহাসনে বসলেন আব্দুল মালিক। আবারও অশান্ত হয়ে উঠলো ইসলামী সাম্রাজ্য। ভেতর ও বাইরের বিদ্রোহ বিব্রত করে তুললো তাঁকে। ভেতরে বিরোধিরা ছিলেন, মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, কূফায় আল মুখতারের নেতৃত্বে শিয়ারা, ইরাকে খারেজীরা এবং বসরায় আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের ভাই মুসাব। সাম্রাজ্যের বাইরে সক্রিয় হয়ে ওঠে ছিলো গ্রীকরা। উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের সাহায্যে। তাই শুরুতেই বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেন আব্দুল মালিক।

আব্দুল মালিক চাইলেন দ্রুত সব সংকটের অবসান ঘটাতে। দায়িত্ব দিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে। তিনি কঠোর হস্তে সকল বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। এতে আব্দুল মালিক খুব হলেন। তিনি হাজ্জাজকে নিযুক্ত করলেন পূর্ব অঞ্চলের প্রতিনিধি।

৭০৫ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল মালিকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম ওয়ালিদ মসনদে বসলেন। তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে পূর্ব অঞ্চলের শাসনকর্তার পদেই বহাল রাখলেন।

হাজ্জাজ এ মহান দায়িত্ব পালনে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। খতম করলেন

তাবৎ আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধ। তারপর মনোনিবেশ করলেন সামরিক বিজয়ে। বিশ্বের তিন পথে পাঠালেন তিন সামরিক বাহিনী। প্রথম পথ দিয়ে মুসলিম ফৌজ এগিয়ে গেলো মধ্য এশিয়ার ফারগনা ও কাশগড় পর্যন্ত, দ্বিতীয় পথ ধরে মুসলিম রণতরী জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে পৌঁছে গেলো স্পেন ও ফ্রান্সের সীমান্তে, তৃতীয় পথ ধরে মুহম্মদ বিন কাসিমের স্বল্প সংখ্যক সৈন্য পৌঁছে গেলো সিন্ধুর উপকূলে।

## আঠারো

মধ্য এশিয়ার পাহাড়ী পথ। বন্ধুর। এঁকে বেঁকে চলেছে দূর অজানা কোনো গ্রামে, জনপদে। শোনা গেলো ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এগিয়ে চলেছেন এক মুসলিম সেনাপতি। নাম তাঁর কুতায়বা বিন মুসলিম। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোর নির্দেশ পালনের জন্যে চলেছেন তুর্কীস্তানের উদ্দেশ্যে। সেখানকার শাসকরা বেশ কয়েক বছর ধরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, খলিফাকে অমান্য করেছে তারা। রাজস্ব পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে, এমনকি অত্যাচার করছে নিরীহ মুসলিম প্রজাদের ওপর। হত্যা করছে তারা অসহায় নারী ও শিশুদের। তাই তো এই অভিযানে বেরিয়ে পড়া। দুর্গম পাহাড়ি পথ। দূরত্ব। তবু যেতে হবে। হাজ্জাজের কঠোর আদেশ। লঙ্ঘন করা দুঃসাধ্য।

৭০৫ খ্রিস্টাব্দে গরমের মওসুম। সেনাদল নিয়ে জৈহুন নদীর তীরে পৌঁছালেন কুতায়বা। ঘোড়া নিয়ে সাঁতরে পার হলেন সেই বিশাল স্রোতস্বিনী। তারপর আক্রমণ করলেন তুর্কীস্তানের কয়েকটি সীমান্ত রাজ্যের ওপর। বশ্যতা স্বীকার করলো সেসব রাজ্যের শাসকরা। তারপর এলো শীতের মওসুম। সৈন্যদল নিয়ে মারভে ফিরে এলেন কুতায়বা।

তুর্কিস্তানের এক বিখ্যাত জনপদের নাম বিকন্দ। ৭০৬ খ্রিস্টাব্দে কুতায়বা বিকন্দ আক্রমণ করলেন। হাজার হাজার তুর্কী এসে জমা হলো বিকন্দ রক্ষায়। মুসলিম বাহিনী অবরোধ করে রাখলো তাদের। অবরোধ স্থায়ী হলো দু'মাস। শেষ পর্যন্ত উদ্যম হারিয়ে আত্মসমর্পণ করলো তুর্কীরা।

৭০৭ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মে কুতায়বা সুনয়েদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর জয়ী হলো মুসলিম বাহিনী। এরপর মুসলিমরা আক্রমণ করলো বোখরা। এখানেও তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হলো মুসলিম ফৌজ। বোখরার শাসনকর্তার সাহায্যে চারিদিক থেকে এলো বিপুল সংখ্যক সৈন্য। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধের পর জয়ী হলো মুসলিমরা।

কেটে গেলো প্রায় তিনটি বছর। এলো ৭১০ খ্রিস্টাব্দে। অক্সাস পার হয়ে খারিযম আক্রমণ করলেন কুতায়বা। খারিযমের শাহ বশ্যতা স্বীকার করে শান্তি স্থাপন করলেন মুসলমানদের সাথে। ইতোমধ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো সমরকন্দ। সেখানকার শাসক সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসলো মুসলিম শাসন; অত্যাচার শুরু করলো নব দীক্ষিত মুসলিমদের ওপর। বাধ্য হয়ে কুতায়বাকে যেতে হলো সেখানে। এক ভীষণ যুদ্ধের পর সমরকন্দ দখলে এলো মুসলিমদের। এরপর কুতায়বা দীর্ঘ দু'বছর ধরে খোজান্দ, শাশ ও ফরগনাসহ আরো কয়েকটি অঞ্চল দখল করে নিলেন।

৭১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি চীনের সীমান্ত রাজ্য কাশগড় আক্রমণ করলেন এবং তা সহজেই তাঁর অধিকারে এলো। বিজয়ীর বেশে কুতায়বা কাশগড়ের উঁচু পাহাড় চূড়ায় উঠলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন খলিফার পরবর্তী আদেশের জন্যে। গোটা চীন জয় করার অদম্য ইচ্ছা তাঁর। কিন্তু হায়! সে আশা আর পূর্ণ হলো না তাঁর। কারণ তখন খলিফা ওয়ালীদ ও হাজ্জাজ আর নেই। ওয়ালীদের মৃত্যুর পর নতুন খলিফা হয়েছেন তাঁর ভাই সুলায়মান। যিনি ওয়ালীদ ও হাজ্জাজের প্রতি রুষ্ট ছিলেন। রাজধানীতে ডেকে পাঠালেন কুতায়বাকে। তাঁর অনুপস্থিতিতে থেমে গেলো চীন অভিযান।

আটটি জাহাজ। তির তির করে এগিয়ে চলেছে বিশাল সিন্ধু নদের বুক চিরে। এতে আছে সিংহলে পরলোকগত আরব বণিকদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা, এছাড়াও খলিফা ওয়ালীদের জন্য সিংহল রাজের পাঠানো উপহার সামগ্রী। সিন্ধুর দেবল বন্দরে এলে এসব জাহাজ লুণ্ঠন করলো সেখানকার জলদস্যুরা। দ্রব্য সামগ্রীর সাথে তারা নিয়ে গেলো নারী ও শিশুদের।

এই মর্মান্তিক খবর বিদ্যুৎ বেগে পৌঁছে গেলো ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের রাজ দরবারে। তিনি যুগপৎ রাগান্বিত ও বিস্মিত হলেন। সাথে সাথে সিন্ধু রাজ দাহিরের কাছে পাঠালেন এক চরম পত্র। পত্রে তিনি জলদস্যুদের শাস্তির দাবি জানালেন এবং অবিলম্বে অপহৃত দ্রব্য ও বন্দীদের ফেরত দেয়ার অনুরোধ করলেন।

পত্রের জবাবে দাহির জানালেন, 'জলদস্যুরা আমার শাসন বহির্ভূত। কাজেই তাদেরকে শাস্তি দিতে আমি অপারগ, অক্ষম।'

দাহিরের দস্যু দমনে অক্ষমতা প্রকাশ ভীষণ ক্ষিপ্ত করে তুললো হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে। তিনি তাকে উচিত শিক্ষা দিতে চাইলেন। অনুমতি নিলেন খলিফা ওয়ালীদের, আয়োজন করলেন সিন্ধু অভিযানের।

৭১০ খ্রিস্টাব্দে। হাজ্জাজ সেনাপতি ওবায়দুল্লাহ্র নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু ব্যর্থ হলো সে অভিযান। এরপর সেনাপতি বুদাইলের নেতৃত্বে পাঠালেন পর পর আরো দু'টি অভিযান। কিন্তু সফল হলো না তাও। পরাজিত মুসলিম সৈন্যদের নির্মমভাবে হত্যা করলো রাজা দাহিরের সৈন্যরা।

৭১১ খ্রিস্টাব্দ। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে পাঠালেন তৃতীয় অভিযান।

ছ'হাজার সুদক্ষ অশ্বারোহী, সম সংখ্যক উষ্ট্রারোহী এবং তিন হাজার তীরন্দাজ সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন মুহম্মদ বিন কাসিম। সমুদ্র পথে একটি নৌবহরও তাঁকে সাহায্য করলো এ অভিযানে।

মাকরানের মধ্যদিয়ে এগিয়ে গেলেন মুহম্মদ বিন কাসিম। সেখানকার শাসনকর্তাও একদল সৈন্য দিয়ে সাহায্য করলেন তাঁকে। সিন্ধুর নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা রাজা দাহিরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিলো। তারা চাইলো হিন্দু শাসনের অবসান ঘটাতে। জাঠ ও মেডরা তাই যোগ দিলো মুসলিম বাহিনীতে।

৭১২ খ্রিস্টাব্দ। দেবল বন্দরে পৌঁছালেন মুহম্মদ বিন কাসিম। এখানে ছিলো সুরক্ষিত দেবল দুর্গ। যা রক্ষার দায়িত্বে ছিলো ব্রাহ্মণ ও রাজপুতরা। মুহম্মদ

বিন কাসিম প্রথমেই এই দুর্গ দখল করতে চাইলেন। দুর্গের মধ্যে ছিলো দেবল মন্দির। যার চূড়ায় উড়ছিলো একটি লাল রঙের নিশান। হিন্দু সৈন্যদের বিশ্বাস ছিলো, যতোক্ষণ এই নিশান উড়তে থাকবে, ততোক্ষণ তাদের কেউ পরাজিত করতে পারবে না। মুহম্মদ বিন কাসিম হিন্দুদের এ বিশ্বাস বিনষ্ট করতে চাইলেন। মনজানিকের (প্রস্তর নিক্ষেপক কামান) সাহায্যে নিশান উড়িয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন তিনি। তাই করা হলো। তারপর শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। মুসলিম সৈন্যদের তীব্র আক্রমণে টিকতে পারলো না হিন্দু সৈন্যরা। অল্পক্ষণের মধ্যে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো তারা। দেবল বন্দর দখলে এলো মুসলিমদের।

দেবল অধিকারের পর মুহম্মদ বিন কাসিম সসৈন্যে নীরুন শহরে উপস্থিত হলেন। এ শহর ছিলো এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর তত্ত্বাবধানে। তিনি বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেন মুসলিম বাহিনীর কাছে।

নীরুন অধিকারের পর মুহম্মদ বিন কাসিম উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন। অধিকার করলেন সিওয়ান। তারপর আক্রমণ করলেন কুম্ভ নদীর তীরের সিসাম। সামান্য বাধার পর তাও অধিকারে এলো।

মুহম্মদ বিন কাসিম এবার রাওয়ারের দিকে এগুলেন। ওদিকে একের পর এক পরাজয়ে অস্থির হয়ে ওঠে ছিলেন রাজা দাহির। তিনিও বেরুলেন পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে। রাওয়ারে গিয়ে মুখোমুখী হলেন মুসিলম বাহিনীর। উভয় বাহিনীর মাঝখানে ছিলো এক বিশাল নদী। মুসলিম বাহিনী নির্মাণ করলেন নৌকার সেতু, পার হলেন সে নদী। তারপর বীর-বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দাহিরের সৈন্যদের ওপর। চলতে লাগলো আক্রমণ প্রতি আক্রমণ। হঠাৎ একটি তীর এসে লাগলো রাজা দাহিরের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী হলেন তিনি। পরে নিহত হলেন (২০ জুন, ৭১২ খ্রি.) তরবারির আঘাতে।

রাজা দাহিরের মৃত্যুতে মনোবল হারিয়ে গেলো তাঁর সৈন্যদের। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালালো তারা। দাহিরের স্ত্রী রাণীবাঈ ও পুত্র জয়সিংহ আশ্রয় নিলেন রাওয়ার দুর্গে। মুসলিম বাহিনী আক্রমণ করলো সে দুর্গ। রাণী দুর্গ রক্ষার

জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন সৈন্যদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্গের পতন আসন্ন দেখে রাণী ও তাঁর সহচারীরা আত্মহত্যা করলেন, অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে। ফলে রাওয়ার দুর্গ হস্তগত হলো মুসলিমদের।

এবার মুহম্মদ বিন কাসিম বিজয়োল্লাসে এগিয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ্যবাদের দিকে। সেখানকার অধিবাসীরা প্রায় বিনা যুদ্ধে অধীনতা স্বীকার করলো মুসলিমদের।

মুহম্মদ বিন কাসিম এবার রাজা দাহিরের রাজধানী আলোর দিকে অগ্রসর হলেন। আক্রমণ করলেন আলোর দুর্গ। যা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন রাজা দাহিরের এক পুত্র। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেও পরাজিত হলেন। আলোর দুর্গও অধিকারে এলো মুসলিমদের।

এই বিজয়ের সাথে গোটা সিন্ধু অঞ্চল মুসলিমদের অধিকারে এলো। মুহম্মদ বিন কাসিম বিজিত অঞ্চলে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে মুলতানের দিকে অগ্রসর হলেন। মুলতান ছিলো হিন্দু শক্তির শেষ উৎস। হিন্দুরা দীর্ঘ দু'মাস ধরে প্রাণপণ যুদ্ধ করেও পরাজিত হলো। মুলতান বিজয়ের সাথে সাথে রাজা দাহিরের সমস্ত রাজ্যই মুসলিম অধিকারে এলো।

সিন্ধু ও মুলতানে ইসলামী শাসন কায়েম করলেন মুহম্মদ বিন কাসিম। সাম্য ও উদারতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো এ শাসন। প্রধান রাষ্ট্রীয় পদগুলোতে দাহিরের সময়ের হিন্দু কর্মচারীদেরই বহাল রাখলেন তিনি। এমনকি, দাহিরের ব্রাহ্মণ প্রধানমন্ত্রীকে সেই পদেই পুনর্বহাল করা হলো। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হলো ব্রাহ্মণদের।

এরপর মুহম্মদ বিন কাসিম কনৌজ অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন, কিন্তু এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি তাঁর। তার আগেই আততায়ীর হাতে নিহত হলেন তিনি। থেমে গেলো ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয় অভিযান।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই আরবরা বিশ্বজনীন ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়কে ব্যাপক বিস্তারে ব্যাপৃত হন। বেরিয়ে পড়েন বিশ্বের দিকে দিকে। পাহাড়, সাগর, অরণ্য, মরু প্রান্তর পার হয়ে পৌঁছে যান দেশে দেশে। একের পর এক রাজ্য জয় করে উড্ডীন করেন কলেমার পতাকা। এ

ক্রমধারায় তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.)-র আমলে বিজিত হয় উত্তর আফ্রিকার ত্রিপলী ও বারাকা। তারপর খলিফা মুয়াবিয়ার (রা.) শাসনকালে এ বিজয়কে আরো প্রসারিত করেন বিখ্যাত সেনাপতি ওকবা বিন নাফি। তিনি কায়রোয়ানে একটি সুন্দর নগরও প্রতিষ্ঠা করেন। অবশেষে খলিফা প্রথম ওয়ালীদের রাজত্বকালে উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক বিজয়ের পুষ্টি ও পূর্ণতা দান করেন মূসা বিন নাসীর। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে উত্তর আফ্রিকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

ইসলামের আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন উত্তর আফ্রিকা। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসে অবিশ্বাসীরা দলে দলে। আসে দুর্ধর্ষ বার্বার জাতিও। ইসলামের বীর মুজাহিদে পরিণত হয় তারা।

ইসলামী আদর্শে আলোকিত উত্তর আফ্রিকা যখন দ্রুত বৈষয়িক উন্নতির দিকে ধাবিত, তখন প্রতিবেশী স্পেন উপদ্বীপ অতিক্রম করছিলো অধঃপতনের ভয়াল অমানিশা। অসভ্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলো তাদের নিত্য সঙ্গী। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো সাগর পাড়ের এদেশেও পোপ ও মঠের সন্ন্যাসীদের প্রভাব ছিলো অপ্রতিরোধ্য। অতুল ধন-সম্পদের মালিক ছিলো তারা। তাদের প্রভাব এতোই বেশি ছিলো যে দেশের রাজারও ভাগ্য নির্ভর করতো তাদের সিদ্ধান্তের ওপর।

ভারতবর্ষের মতো স্পেনেও ছিলো নির্মম জাতিভেদ প্রথা। এ প্রথার শিকার ছিলো ইহূদীরা। খ্রিস্টানরা চরম ঘৃণা করতো তাদের। চালাতো তাদের ওপর নির্মম নির্যাতন। কারণে-অকারণে কঠোর শাস্তি দিতো ইহূদীদের, এমনকি মৃত্যুদণ্ড দিতেও দ্বিধা করতো না। সর্বোপরি ছিলো রাজা ও শাসক গোষ্ঠীর অবিচার, অত্যাচার। স্পেনে তখন গথরাজা রডারিকের রাজত্বকাল চলছিলো। তার লৌহ কঠোর পদতলে পড়ে আর্তনাদ করছিলো সাধারণ মানুষ।

কায়রোয়ানে বসে স্পেনের দুরাবস্থার সব খবরই পেলেন সেনাপতি মূসা। নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্যে স্পেন অভিযানের সংকল্প করলেন তিনি। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালো প্রবেশ পথ কিউটা। স্পেনের অঙ্গরাজ্য।

এখানে ছিলো এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। খুব উচ্চ ও প্রাচীর বেষ্টিত এ দুর্গের অধিপতি ছিলেন কাউন্ট জুলিয়ান। রাজা রডারিকের নিযুক্ত শাসনকর্তা। স্পেনকে মুসলিম আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে কিউটার অতন্দ্র প্রহরী তিনি। ওদিকে সেনাপতি মূসা চান স্পেনে প্রবেশ পথের এই কাঁটাটি উপড়ে ফেলতে। আর এজন্যে সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন তিনি।

শিগ্‌গীরই সে সুযোগও এসে গেলো। কিউটা দুর্গের অধিপতি কাউন্ট জুলিয়ান আর স্পেন রাজ রডারিকের মধ্যে শুরু হলো শত্রুতা, আর এই বিবাদের সুযোগ নিয়েই স্পেনে প্রবেশ করলো মুসলিম বাহিনী।

সমকালীন প্রচলিত প্রথা অনুসারে স্পেনের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা তাদের মেয়েদের রাজকীয় আদব-কায়দা শিক্ষার জন্যে রাজ দরবারে পাঠাতেন। এই রীতি অনুযায়ী কিউটার শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ান তাঁর সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিন্ডাকে রাজা রডারিকের দরবারে পাঠিয়ে ছিলেন। অনিন্দসুন্দরী ফ্লোরিন্ডার রূপে মোহিত হলো রাজা রডারিক। পাশবিক কামনা জেগে উঠলো তার মনে। কামনার আতিশয্যে তাই সে একদিন ধর্ষণ করলো অসহায় ফ্রোরিন্ডাকে। ছিনিয়ে নিলো তার নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ– সতীত্ব।

ফ্লোরিন্ডা তার এই দুর্দশার কথা চিঠির মাধ্যমে জানালো পিতা জুলিয়ানকে। জুলিয়ান ছিলেন সিংহাসনচ্যুত উইটিজারের জামাতা। রডারিক উইটিজারকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন বলে পূর্ব থেকেই রডারিকের প্রতি ক্ষোভ ছিলো জুলিয়ানের। তার ওপর মেয়ের এই দুর্দশার কথা জেনে রাগে অস্থির হয়ে উঠলেন। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার সংকল্প করলেন তিনি। তবে তিনি তাঁর এ সংকল্পের কথা জানতে দিলেন না কাউকে।

মেয়ের চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে তিনি চলে গেলেন রাজধানীতে। রাজা রডারিককে যথারীতি সম্মান দেখিয়ে মেয়েকে কিছুদিনের জন্যে নিয়ে যেতে চাইলেন কিউটায়। রাজা রডারিক মনে করলো, জুলিয়ান তার কুকীর্তির কোনো খবরই রাখেন না। তাই তিনি জুলিয়ান ও তাঁর মেয়েকে উপযুক্ত সম্মানের সাথে বিদায় দিলেন। রাজধানী টলেডো ত্যাগের সময় রডারিক

জুলিয়ানকে কিউটা থেকে কয়েকটি শিকারী বাজপাখি পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধও করলেন। জুরিয়ান ইঙ্গিতপূর্ণ জবাব দিলেন ঃ

'জ্বি হ্যাঁ, আপনার জন্যে আমি এমন চমৎকার কিছু বাজপাখি পাঠিয়ে দেবো যা আপনি কখনো দেখেননি।'

কিউটায় পৌঁছেই কাউন্ট জুলিয়ান গেলেন কায়রোয়ানে। মূসার রাজ দরবারে। বৃদ্ধ সেনাপতি মূসার সামনে দাঁড়িয়ে সজল চোখে শুনালেন তাঁর মেয়ের করুণ কাহিনী। সাথে সাথে তিনি মূসাকে আমন্ত্রণ জানালেন স্পেন অভিযানের।

কাউন্ট জুলিয়ানের এ আবেদন একেবারে লুফে নিলেন মূসা। তিনি খলিফা ওয়ালীদের অনুমতি নিয়ে প্রথমে পরীক্ষামূলক এক অভিযান পাঠালেন। চারশ' সৈন্যের সে বাহিনী স্পেনের আলজেসিরাস বন্দরে সফল অভিযান চালিয়ে ফিরে এলো। এরপর মূসা নবদীক্ষিত বার্বার মুসলিম তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে পাঠালেন সাত হাজার সৈন্যের আরেক বাহিনী।

৭১১ খ্রিস্টাব্দ। জুলাই মাসের এক অন্ধকার রজনী। উন্মুক্ত আকাশ। সে আকাশে মিট মিট করছে অসংখ্য তারকা। জিব্রাল্টার প্রণালীর বুকে ভাসছে চারটি যুদ্ধ জাহাজ। এক জাহাজের মাস্তুলে বসা তরুণ সেনাপতি তারিক। ভীষণ চিন্তামগ্ন তিনি। আগামী কাল সূর্য ওঠার অপেক্ষা মাত্র। মাত্র সাত হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেন ভূমিতে অবতরণ করতে হবে তাঁকে। তাই মাঝে মাঝে মহান আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন জানাচ্ছেন তিনি ঃ

'মাওলা! তোমার পিয়ারা হাবীবের (সা.) এ স্বল্প সংখ্যক গোলামকে নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে নতুন মহাদেশে আমরা অবতরণ করতে যাচ্ছি। জাগতিক উপায়– উপকরণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না। একমাত্র তোমারই সাহায্যের উপর আমাদের ভরসা।' (মুহিউদ্দীন খান ঃ স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সা.) পৃ. ৪২)

এমনি মুনাজাত আর চিন্তা-ভাবনার মাঝখানে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। ঘুমের মধ্যে দেখলেন এক শুভ স্বপ্ন ঃ

'রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের এক বিরাট জামাত নিয়ে স্পেন ভূমিতে অবতরণ করেছেন। সবাই যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। হুযূর (সা.) তারিককে লক্ষ্য করে বলছেন, তারিক! নির্ভয়ে অগ্রসর হও। মুসলমানদের সাথে নরম ব্যবহার করবে। সর্বাবস্থায় অঙ্গিকার পূর্ণ করার চেষ্টা করবে।' (পূর্বোক্ত ঃ পৃ. ৪২)

'এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বাহিনীসহ স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে লাগলেন। তারিকও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সেই পবিত্র কাফেলার অনুগমন করতে থাকলেন। (পূর্বোক্ত ঃ পৃ. ৪২)

এই স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভেঙ্গে গেলো তারিকের। তিনি আনন্দ আপ্লুত চিত্তে তাঁর সৈন্যদের কাছে এ পবিত্র স্বপ্নে কথা বর্ণনা করলেন। শক্তি, সাহস আর গর্বে ফুলে উঠলো সবার বুক।

পরের দিন তারিক সসৈন্যে জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে স্পেনের এক পার্বত্য এলাকায় অবতরণ করলেন। এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন তিনি। সেখানে উড্ডীন করলেন ইসলামের পতাকা। তারপর নৌবহরের অধ্যক্ষকে জলদগম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিলেন ঃ

'আমাদের যুদ্ধ জাহাজগুলো পুড়িয়ে ফেলো।'

'এই জাহাজগুলো দিয়েই তো আমরা সাগর পার হয়ে এসেছি। প্রয়োজন হলে তা দিয়েই আবার ফিরে যেতে হবে।' বললো সৈন্যরা।

তারিক তখন সৈন্যদের উদ্দেশে বললেন, 'আমাদের সামনে দু'টি পথই খোলা রয়েছে– একটি হলো যুদ্ধে জয়লাভ করা আর অপরটি হলো মৃত্যুবরণ করা। পালাবার কোনো পথ নেই।'

সেনাপতির আদেশ পালন করলেন নৌবহরের অধ্যক্ষ। পুড়িয়ে দিলেন জাহাজ চারটি। তারপর তারিক এগিয়ে চললেন রাজধানীর দিকে।

ইতোমধ্যে মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর শুনে ছিলেন এক সীমান্ত শাসনকর্তা। বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি। মুসলিম বাহিনীকে বাধা দিলেন তীব্রবেগে। কিন্তু ঈমানের বলে বলিয়ান মুসলিম মুজাহিদের

গতিরোধ করতে পারলেন না তিনি। পরাজিত হয়ে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

এরপর মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলার জন্যে এগিয়ে এলেন মাসিয়া প্রদেশের গভর্ণর থিওডোমীর। ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে দেখে তিনি জয় সম্পর্কে এতোটা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, রাজা রডারিককে সংবাদ দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করেননি। ভেবে ছিলেন, মুসলিম বাহিনী ধ্বংস করেই তাঁর কৃতিত্বের খবর দিবেন রাজাকে। তিনি পূর্বের পরাজিত সৈন্যদের ভর্ৎসনা করলেন ঃ

'তারা ভীরু, কাপুরুষ। তাদের ভীরুতার জন্যেই পরাজয় হয়েছে।'

থিওডোমীর তাঁর সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে ক্ষুদ্র মুসলিম সেনাদের আক্রমণ করলেন। মুসলিম সেনারাও সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্পেনীয়দের উপর। তাঁদের আক্রমণের তীব্রতা দেখে থিওডোমীর বুঝতে পারলেন, তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মুসলিম বাহিনী আদৌ দুর্বল নয়। অমিত শক্তির অধিকারী তারা।

তবু মুসলিম ফৌজদের রুখে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু পরাজিত হলো তাঁর বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেন থিওডোমীর। পেছনে রেখে গেলেন তাঁর হাজার হাজার সৈন্যের লাশ।

পলায়ন করেও স্বস্তি পেলেন না থিওডোমীর। প্রতিশোধের আগুনে সারাক্ষণ জ্বলতে লাগলো তাঁর মন। তাই আবার সৈন্য সংগ্রহ করলেন তিনি। যুদ্ধ করলেন আবারও। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি মুছতে পারলেন না। এবারও। তাই তিনি বাধ্য হয়ে চিঠি লিখলেন রাজা রডারিকের কাছে ঃ

'মহারাজ,

একদল বহিরাগত শত্রু আক্রমণ করেছে আমাদের দেশ। আমি তাদের সঠিক পরিচয় জানি না। তবে শুনলাম তারা জাতিতে মুসলিম। এসেছে উত্তর-আফ্রিকা থেকে।

তাদের সৈন্য সংখ্যাও অতি অল্প। সাত হাজারের বেশি হবে না। তাদের

পোশাক-পরিচ্ছদ খুব সাধারণ। অস্ত্র-শস্ত্র হালকা। অশ্বের সংখ্যাও কম। কিন্তু তাদের শক্তি-সাহস অসীম। শত্রুর বিরুদ্ধে তারা সিংহের চেয়েও শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর।

এই হিংস্র আক্রমণকারীদের আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করার জন্য আমি পর পর দু'বার যুদ্ধ করেছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, দু'বারই আমি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছি। এখন দেশ মাতৃকার মুক্তি কামনায় এই আক্রমণকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার জন্য মহারাজের কাছে অনুরোধ করছি।

আপনার বিশ্বস্ত

থিওডোমীর।

থিওডোমীর বিশেষ দূত এই পত্র নিয়ে যখন রাজধানীতে হাজির হলো, তখন রাজা রডারিক রাজধানীতে অনুপস্থিত। বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত এক প্রদেশে।

সেখানে যখন এই চিঠি পেলেন, তখন ভীষণ ভীত হয়ে পড়লেন তিনি। বার বার পড়লেন চিঠিখানা। তার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো বিদেশী যোদ্ধাদের ছবি ঃ

মাথায় তাদের সাদা পাগড়ী, হাতে তাদের উদ্ধত বর্শা। আরো ভেসে উঠলো অসহায় ফ্লোরিডার ছবি ঃ

করজোড় আর চোখের জলে তার ইজ্জত রক্ষার করুণ মিনতি। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো এমনি আরো অসংখ্য নিরীহ মানুষের মুখচ্ছবি। যাদের ওপর সীমাহীন যুলুম করেছেন তিনি।

রডারিক চরিত্রহীন কিন্তু বুদ্ধিমান। তার আর বুঝতে বাকী রইলো না, এ কাজ কাউন্ট জুলিয়ানের। মনে পড়লো জুলিয়ানের সেই বিদায় বেলার কথা ঃ

'আমি এমন চমৎকার কিছু বাজপাখি পাঠিয়ে দেবো যা আপনি কখনো দেখেননি।'

তখন তিনি বুঝতে পারেননি, এই বাজপাখি বলতে জুলিয়ান কী বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু আজ তার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।

অবস্থা উপলব্ধি করে সৈন্য সংগ্রহে মনোযোগ দিলেন রডারিক। দূত পাঠালেন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছে। যার যতো সৈন্য আছে পাঠাতে বললেন রাজধানীতে। সেই সাথে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ উপকরণও।

শিগ্‌গীরই সমবেত হলো এক লক্ষ সৈন্যের সুসজ্জিত বাহিনী। এর মধ্যে ছিলো অনেক রাজপুত্র ও খ্রিস্টান পুরোহিত। খ্রিস্টান পুরোহিতরা এসেছে ক্রুশ হাতে নিয়ে। খ্রিস্টান সৈন্যদের আশীর্বাদ করার জন্যে।

এ সময় মুসলিম সেনাপতি তারিক ছিলেন কার্টেজা শহরে। সেখান থেকে সন্ধানী দল পাঠালেন তিনি। সে দল ফিরে এসে রডারিকের প্রস্তুতির খবর জানালো তাঁকে। চিন্তিত হলেন তারিক। ঠিক তখনই মূসা আফ্রিকা থেকে পাঠালেন আরো পাঁচ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী। বার্বার অশ্বারোহী সৈন্য সেসব। এতে মুসলিম শক্তি আরো বেড়ে গেলো।

মুসলিম সেনাদল নিয়ে ওয়াডেলেট নদীর তীরে অবস্থান নিলেন তারিক। ওদিক থেকে রডারিকও তার বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলো। এ যুদ্ধের সৈন্য পরিচালক রাজা রডালিক নিজেই।

৭১১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই। আলোক উজ্জ্বল সকাল। যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলো দু'পক্ষ। তারিক মুসলিম সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'প্রিয় সৈন্যরা! তোমাদের সামনে শত্রু, পেছনে নদী, পালাবার কোনো পথ নেই। সাহস ও আশার সঙ্গে যুদ্ধ না করলে বাঁচার আশা নেই।'

এরপর উভয় পক্ষই ঝাঁপিয়ে পড়লো যুদ্ধ ক্ষেত্রে। আক্রমণ প্রতি আক্রমণ। মুসলিম সৈন্যরা নিজেদের অবস্থা বুঝে মরিয়া হয়ে উঠলো। তীব্রবেগে আঘাত করতে লাগলো খ্রিস্টান সৈন্যদের। মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো স্পেনীয়রা। নিহত হলো তাদের হাজার হাজার সৈন্য। রাজা রডারিক নিরুপায় হয়ে ঝাঁপ দিলেন নদীতে। অশুভ মৃত্যুর মধ্যদিয়ে পরজগতে অনন্ত যাত্রা হলো তার।

তারপর তারিক তাঁর সৈন্যদের তিন দলে ভাগ করলেন। পাঠালেন তিন দিকে। প্রথম বাহিনী অধিকার করলো আলডিরা ও আরচিদোনা। দ্বিতীয় দল অগ্রসর হলো ইসিজা ও টলেডোর দিকে। মুসলিম বাহিনী যখন টলেডোতে উপস্থিত হলো, তখন সেখানে শাসক গোষ্ঠী ও অভিজাত শ্রেণীর কোনো লোক ছিলো না। তারা রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে ছিলো সবাই। কেবল ছিলো ইহুদীরা, উইটিজারের পুত্ররা আর দলবল সহ কাউন্ট জুলিয়ান।

তাই এক প্রকার বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী অধিকার করলো রাজধানী টলেডো। তৃতীয় বাহিনী মালাগা ও অরহিউল্যা অধিকার করলো। এ বিজয়ের ফলে থিওডোমীর শাসিত সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব স্পেন মুসলিমদের করতলগত হলো।

ওদিকে কায়রোয়ানে বসে ভীষণ বিচলিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন বৃদ্ধ সেনাপতি মূসা বিন নাসীর। কেননা বিজয়ের গৌরব তিনিও নিতে চান। তাই চলে এলেন স্পেনে। আঠারো হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে। জয় করলেন কমোনা, সেভিল ও মেরিদা। এভাবে স্পেনের সমস্ত এলাকা মুসলিম অধিকারে এলো। মূসা তাঁর ছেলে আব্দুল আজিজকে স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। সেভিলকে করলেন বিজিত রাজ্যের রাজধানী।

বিজিত হলো সমস্ত স্পেন। এবার দুই সেনাপতি পরিকল্পনা করলেন, গোটা ইউরোপ জয় করবেন। ফ্রান্স, দক্ষিণ ইউরোপ, তুরস্ক– সব জায়গায় উড্ডীন করবেন ইসলামের কলেমা খচিত পতাকা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী পিরেনীজ পর্বত পার হলেন তাঁরা। এগিয়ে গেলেন রোন নদী পর্যন্ত। দখল করলেন লিয়ন্‌স নগরী দুর্গ। কিন্তু হায়! এ সময় দরবারে খেলাফত থেকে ডাক এলো তাঁদের। সাড়া দিতে বাধ্য হলেন সে ডাকে। তাঁদের স্বপ্ন স্বপ্নই রইলো, তা আর সফল হলো না, কোনো দিন।

# উনিশ

সময় বয়ে চললো। এক এক করে পার হলো প্রায় তিনশ' বছর। ভারতের বিজিত ভূ-খণ্ডে (সিন্ধু ও মুলতান) মুসলিম শাসন দুর্বল হয়ে পড়লো, ধীরে ধীরে। শেষ অবধি শুধু মুলতান ছাড়া সমস্ত অধিকৃত অঞ্চলই হাতছাড়া হলো মুসলিমদের। তখন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযান চালালেন গজনীর অধিপতি সুলতান মাহমুদ (৯৯৭–১০৩০ খ্রি.)।

এ অভিযানের কয়েকটি জোরালো কারণও ছিলো– যা তাঁকে উত্যক্ত করেছিলো বার বার, বাধ্য করেছিলো ভারতের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে। উত্তর-ভারতের হিন্দু রাজাদের বার বার গজনী আক্রমণ, চুক্তি লঙ্ঘন, বিদ্রোহীদের উস্কানী দান ইত্যাদি কারণেই তিনি অভিযান পরিচালনা করেন এক এক করে সতেরোটি।

তিনি ছিলেন গজনীর সুলতান সবুক্তগীনের পুত্র। সবুক্তগীন ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী ও দিগ্বিজয়ী বাদশাহ। তাঁর সময়ে (৯৭৭–৯৯৭ খ্রি.) গজনী রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। তিনি খোরাসান, সিস্তান, জালালাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন। পাঞ্জাবের প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যান তাঁর রাজ্যসীমা। তাঁর এ বিজয়ে ভীষণ শঙ্কিত হয়ে পড়েন পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী বংশের রাজা জয় পাল। তিনি চিন্তা করলেন, সবুক্তগীন যদি কাবুল হতে ভারত আক্রমণ করেন, তবে তাঁকে ঠেকানো একা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এমনি চিন্তা-ভাবনা নিয়ে সারা উত্তর ভারত ঘুরে বেড়ালেন তিনি। সবুক্তগীনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে সতবেত হবার জন্যে রাজী করালেন প্রতিবেশী হিন্দু রাজাদের। যে করেই হোক তার আক্রমণকে প্রতিহত করতেই হবে। তিনি তাই সম্মিলিত হিন্দু বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকলেন।

ওদিকে সবুক্তগীনও উপযুক্ত জবাব দিতে এগিয়ে এলেন। ৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে গজনী ও লাঘমানের মধ্যবর্তী ঘুজুক নামক স্থানে শুরু হলো এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। কিন্তু দুর্ভাগ্য জয়পালের ঃ গোটা উত্তর ভারতের সম্মিলিত হিন্দু শক্তি

নিয়েও সবুক্তগীনের কাছে হেরে গেলেন তিনি। তারপর সন্ধি করে ফিরে এলেন নিজ রাজ্যে। কিন্তু দেশে ফিরেই সন্ধি চুক্তি লঙ্ঘন করলেন জয়পাল। এতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হলেন সবুক্তগীন। চাইলেন জয়পালকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। কিন্তু সময়ের অভাবে পেরে উঠলেন না। আয়ু ফুরিয়ে এলো তাঁর। ৯৯৭-তে ইনতিকাল করলেন তিনি। মৃত্যুর আগে জয়পালকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন তাঁর যোগ্য পুত্র মাহমুদের ওপর।

সিংহাসনে বসলেন মাহমুদ। প্রথম দু'বছর কেটে গেলো তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনে। তারপর নজর দিলেন ভারত সীমান্তের দিকে।

১০০০ খ্রিস্টাব্দে ভারত সীমান্তে প্রথম অভিযান করলেন তিনি। দখল করলেন খায়বার গিরিপথের কয়েকটি নগর ও দুর্গ। ফলে সুরক্ষিত হলো তাঁর রাজ্যর সীমান্ত এলাকা।

১০০১-এ দ্বিতীয় অভিযান চালালেন চুক্তিভঙ্গকারী পাঞ্জাবের রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে। পেশোয়ারের নিকট ভীষণ যুদ্ধের পর পরাজিত ও বন্দী হলেন জয়পাল। পরে অবশ্য মুক্তি পেলেন কয়েকটি শর্তের বিনিময়ে। কিন্তু মুক্তি পেলেও বার বার পরাজয়ের গ্লানি সইতে পারলেন না তিনি। 'অপমানের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়' মনে হলো। তাঁর আর তাই রাজ্যভার পুত্র আনন্দ পালের ওপর দিয়ে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন তিনি।

ঝিলাম নদীর তীরে ভিরা রাজ্যের রাজা ছিলেন বিজয় রায়। তিনিও ভঙ্গ করলেন প্রতিশ্রুতি। ফলে ১০০৪-এ মাহমুদ তৃতীয় অভিযান পরিচালনা করলেন তাঁর বিরুদ্ধে। বিজয় রায়ও প্রচণ্ড বেগে প্রতিরোধের চেষ্টা করলেন। কিন্তু মাহমুদের তীব্র আক্রমণের মুখে ভেঙ্গে পড়লো তাঁর সকল প্রতিরোধ ব্যবস্থা। শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন তিনি। তারপর পালাবার কোনো উপায় না পেয়ে আত্মহত্যা করলেন তিনিও।

সুলতান মাহমুদ যখন বিজয় রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মুলতানের মধ্যদিয়ে ফিরে আসছিলেন, তখন মুলতানের ইসমাইলী শিয়া শাসক আবুল ফতেহ

দাউদ তাঁর সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করেন। এজন্যে ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ মুলতান আক্রমণ করেন। দাউদ পরাজিত হয়ে বার্ষিক কর দিতে অঙ্গিকার করে সে যাত্রা রক্ষা পেলেন।

ওদিকে আনন্দ পালও পিতার পদাংক অনুসরণ করলেন। সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করলেন তিনিও। তাঁর ডাকে আবারও একত্রিত হলো উত্তর ভারতের হিন্দু রাজারা। দিল্লী, আজমীর, কালিঞ্জর, কনৌজ, উজ্জীবিনী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা আনন্দ পালের সাথে যোগ দিলো। হিন্দু রাজাদের এই প্রস্তুতি বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালো মাহমুদের সামনে। ১০০৮-এ সসৈন্যে এগিয়ে গেলেন তিনি। ওয়াই হিন্দের নিকট মোকাবিলা করলেন সম্মিলিত হিন্দু বাহিনীর। এক বিরাট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পরপজিত হলো সম্মিলিত শক্তি। মাহমুদ আনন্দ পালের রাজধানী দখল করলেন। সেই সাথে লাভ করলেন বিপুল পরিমাণে ধনরত্ন।

এভাবে মাহমুদ একে একে নগর কোট (১০০৯ খ্রি.), থানেশ্বর (১০১৪ খ্রি.), কাশ্মীর (১০১৫ খ্রি.), কনৌজ (১০১৮ খ্রি.), গোয়ালিয়র (১০২২ খ্রি.), কালিঞ্জর (১০২৩ খ্রি.), সোমনাথ (১০২৬ খ্রি.)সহ সর্বমোট সতেরোটি অভিযান করেন। জয় লাভ করেন প্রতিটি অভিযানে।

মাহমুদের সবচে' উল্লেখযোগ্য অভিযান হলো কাথিওয়াড়ের সোমনাথ মন্দির। এ মন্দির ছিলো তৎকালীন উত্তর ভারতের ধন-ভাণ্ডার। রাজারা তাঁদের সমস্ত ধন-সম্পদ জমা রাখতো এখানে। এমনকি, জলদস্যুরাও রাখতো তাদের লুণ্ঠিত ধন রত্ন। এজন্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তিনি এই মন্দির আক্রমণ করেন। ১০২৫-এর শেষ দিকে গজনী হতে যাত্রা করেন তিনি। ১০২৬-এর ৬ জানুয়ারি সোমনাথের দ্বারে এসে উপস্থিত হন। হিন্দু রাজারা তাঁদের প্রাণতুল্য সোমনাথ রক্ষার জন্যে প্রবল বেগে বাধা দিয়েও পরাজিত হলেন। মন্দিরের সব ধনরত্ন হস্তগত হলো মাহমুদের।

১০৩০ খ্রিস্টাব্দে গজনীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি কেবল পাঞ্জাব রাজ্যই নিজ শাসনে রাখেন।

মাহ্‌মুদের এসব বিজয়ের রক্ত রঙিন পথ ধরেই ভারতবর্ষে ইসলামের পরবর্তী বিজয়ের পথ সুগম হয়। নতুন জায়গা, নতুন ধর্ম, নতুন ঐতিহ্যের ওপর মুসলমানদের জয় যাত্রায় দুইটি বিজয় অভিযান সবচে' বেশি উল্লেখযোগ্য। ১. মুহম্মদ ঘোরীর উত্তর ভারত অভিযান ২. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়।

ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা তখন অত্যন্ত নাজুক ও শোচনীয়। ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত গোটা উত্তর ভারত। সেসব রাজ্যের মধ্যে ছিল সর্বদা শত্রুতা, হানাহানি।

এ সময় উত্তর ভারতে যেসব হিন্দু রাজ বংশ রাজত্ব করছিলো তাদের মধ্যে দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশ, কনৌজের গাহাড়ভাল ও রাঠোর বংশ, গুজরাটের বাঘেলা, বুন্দের খণ্ডের চান্দেলা, বিহারের পাল ও বাংলার সেন বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তখন বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে বিরাজ করছিলো সবচে' অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা। আর্থিক দুর্গতি, রাষ্ট্রিক অত্যাচার, ধর্মীয় অনাচার, সামাজিক নিপীড়ন আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে বিপন্ন ছিলো বাংলার সাধারণ মানুষ। কৌলিন্যবাদী সেন রাজ বংশের নির্মম নির্যাতনে দগ্ধ হচ্ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধরা।

## বিশ

খায়বার গিরিপথ। প্রস্তরময়। অন্ধকার। এঁকেবেঁকে চলে গেছে ভারত অভিমুখে। এই দুর্গম পথেই চলেছেন গজনীর সুলতান মুহম্মদ ঘোরী। অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে। উত্তর ভারত অভিযানে। আজমীরের চৌহান রাজ পৃথ্বিরাজের কানে আগেই গিয়েছিলো এ সংবাদ। তিনি প্রায় দু'লাখ অশ্বারোহী ও তিন হাজার হস্তী আরোহী সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে মুহম্মদ ঘোরীর মোকাবিলায় এগিয়ে গেলেন। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে থানেশ্বরের প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে তরাইন নামক স্থানে মুখোমুখী হলো দুই বাহিনী। বেধে গেলো

ভীষণ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরী পরাজিত ও আহত হয়ে ফিরে গেলেন স্বদেশে।

দিন কাটতে লাগলো। দেহের ক্ষত শুকিয়ে এলো মুহম্মদ ঘোরীর, কিন্তু মনের ক্ষত শুকালো না। বরং তা আরো বেড়ে গেলো, শত গুণে। প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো তাঁর মনে, তাই আবার মনে মনে তৈরি হতে লাগলেন তিনি। এমনি সময় ঘটে গেলো এক অলৌকিক ঘটনা ঃ

বিখ্যাত পীরে কামেল খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.) তখন আজমীরে উপস্থিত। উত্তর ভারতের নানা জায়গায় ইসলাম প্রচারের পর এখানে এসেছেন তিনি। প্রতিদিন তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করছে বিপুল সংখ্যক মানুষ। তিনি পৃথ্বিরাজকেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন ঃ

'হে পৃথ্বিরাজ! মূর্তি অচেতন পদার্থ। তার কোনো শক্তি নেই। সে মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না। কাজেই মূর্তি পূজার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। অতএব তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো। তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে।'

খাজা সাহেবের পত্র পেয়ে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন পৃথ্বিরাজ। রাগের সাথে বলতে লাগলেন ঃ

'একজন সাধারণ মুসলমানের এতোদূর স্পর্ধা! আমাকেও কিনা পিতা-মাতার ধর্ম ত্যাগ করতে বলে! তাছাড়া হিন্দু রাষ্ট্রে বাস করে হিন্দুদের ধর্ম নিয়ে কটূক্তি। দেখাচ্ছি মজা।'

সাথে সাথে সৈন্যদের তৈরি হতে বললেন তিনি। কিন্তু এতে বাধা দিলেন তাঁর মা। তিনি বললেন, 'মুসলিম ফকিরের সাথে যুদ্ধ করে কোনো লাভ হবে না, বরং নিজেরই ক্ষতি হবে। কারণ সে ঐশ্বরিক শক্তি বলে বলিয়ান। কাজেই এ খেয়াল বাদ দাও তুমি।'

মায়ের উপদেশ শুনে পৃথ্বিরাজ নিরস্ত্র হলেন বটে কিন্তু তার রাগ মেটেনি।

ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলেন তিনি। ঠিক তখনই ঘটলো আরেক ঘটনা ঃ

এক কর্তব্য নিষ্ঠাবান মুসলমান কাজ করতো পৃথ্বিরাজের দরবারে। তার কর্মদক্ষতার বেশ সুনাম ছিলো। তার আচার-আচরণে রাজা নিজেও ছিলেন খুব খুশি। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাজা তার সাথে বিদ্বেষমূলক আচরণ করতে আরম্ভ করলেন। মুসলিম কর্মচারীটি এর কারণ কিছুই বুঝতে পারলো না। চিন্তা করলো ঃ এখন তো খাজা সাহেব আজমীর আছেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তাঁকে সবাই শ্রদ্ধাও করে। কাজেই আমি যদি তাঁর কাছ থেকে সুপারিশ আনতে পারি, তবে রাজা নিশ্চয় আমাকে আগের মতো সুনজরে দেখবেন।

এমনি চিন্তা-ভাবনা করে খাজা সাহেবের দরবারে উপস্থিত হলো লোকটি। খুলে বললো সব ঘটনা। তারপর অনুরোধ করলো, রাজা পৃথ্বিরাজের কাছে তার হয়ে একটু সুপারিশ করার জন্যে। খাজা সাহেবও তার অনুরোধ রাখলেন। এক সুপারিশ পত্র লিখে পাঠালেন পৃথ্বিরাজের কাছে।

পৃথ্বিরাজ তো আগে থেকেই খাজার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন, তার ওপর এই পত্র পেয়ে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। উত্তোজিত হয়ে কর্মচারীকে সেই মুহূর্তে বরখাস্ত করলেন তিনি। আর খাজা সাহেবকে দিলেন অকথ্য ভাষায় গালাগালি।

এ সংবাদও গেলো খাজা সাহেবের কানে। তিনি সাথে সাথে একটা চিরকুট লিখে পাঠালেন পৃথ্বিরাজের কাছে। তাতে লেখা ছিলো ঃ

'আমি তোমাকে জীবিত অবস্থায় মুসলিম সেনাদের হাতে তুলে দিলাম।'

ঠিক ওই দিনে ঘটলো আর একটি অলৌকিক ঘটনা। যা বাস্তবে নতুন পথের মোড় নিলো।

কৃষ্ণপক্ষের রজনী। ঘুটঘুটে অন্ধকার। গোটা গজনী শহর ঘুমের কোলে অচেতন। ঘুমাচ্ছে সবাই। রাজ প্রাসাদে ঘুমাচ্ছেন সুলতান মুহম্মদ ঘোরীও। ঘুমের মধ্যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি ঃ

'এক জ্যোতির্ময় পুরুষ এসে বসেছেন তাঁর সিংহাসনে। তিনি কাছে ডাকলেন ঘোরীকে। তারপর হাত ধরে বললেন, 'যাও বাছা, আমি তোমাকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করার জন্য আদেশ করলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি এবার জয়ী হবে।'

ঘুম ভেঙ্গে গেলো মুহম্মদ ঘোরীর। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন তিনি। নেচে উঠলো তাঁর মন। অসীম সাহস এলো বুকে। পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধের আয়োজনে মেতে উঠলেন তিনি।

১১৯২ খ্রিস্টাব্দ। তরাইন প্রান্তরে সসৈন্যে উপস্থিত হলেন মুহম্মদ ঘোরী। পৃথ্বিরাজও ভারতের শতাধিক রাজার সম্মিলিত শক্তি নিয়ে হাজির হলেন। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। মুসলিম সৈন্যদের 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হতে লাগলো তরাইনের রণক্ষেত্র। সম্মিলিত হিন্দু বাহিনীও মরিয়া হয়ে উঠলো প্রতিরোধ সংগ্রামে। আঘাত হানতে লাগলো তীব্রবেগে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে পারলেন না হিন্দু রাজারা। অল্পক্ষণের মধ্যে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করলেন তারা। পৃথ্বিরাজের ভাই গোবিন্দরায়সহ নিহত হলেন অনেক রাজপুত রাজা। পৃথ্বিরাজ নিরুপায় হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেন। কিন্তু ধরা পড়লেন মুসলিম সৈন্যদের হাতে। নদী পার হবার সময়। তাঁকে বন্দী অবস্থায় মুহম্মদ ঘোরীর সামনে আনা হলো। তিনি নিজ হাতে তাঁকে হত্যা করলেন।

তরাইনের দ্বিতীয় জয় লাভের পর মুহম্মদ ঘোরী ভারতের শাসন ও রাজ্য বিস্তারের ভার বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতবুদ্দীন আইবেক কে দিয়ে গজনীতে ফিরে গেলেন। কুতবুদ্দীন এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে যত্নবান হলেন। দ্রুত গতিতে জয় করে ফেললেন মীরাট (১১৯২ খ্রি.), কোইল, দিল্লী ও রণথম্ভোর (১১০৩ খ্রি.)। তারপর তিনি লাহোর থেকে রাজধানী নিয়ে এলেন দিল্লীতে।

দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি অধিকৃত হলেও ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন সুদৃঢ় হয়নি। কারণ তখনো কনৌজে রাজত্ব করছিলেন পৃথ্বিরাজের মতো এক শক্তিশালী রাজা, জয়চন্দ্র। মুহম্মদ ঘোরী উপলব্ধি করলেন যে, কনৌজ রাজ

জয়চন্দ্রের ক্ষমতা খর্ব করতে না পারলে ভারতে মুসলিম রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করা যাবে না। তাই ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে আবার ফিরে এলেন তিনি। আক্রমণ করলেন কনৌজ। জয়চন্দ্রও সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন তিনি। এরপর মুহম্মদ ঘোরী বারানসীও জয় করে গজনীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাঁর ফিরে যাবার পর কুতবুদ্দীন আইবেক ১১৯৫-তে গোয়ালিয়র, ১১৯৬-তে গুজরাট, ১১৯৭-তে বদায়ুন, ১১৯৮-তে সিরুহী, ১১৯৯-তে মালওয়া এবং ১২০২-১২০৩ খ্রিস্টাব্দে কালিঞ্জ্র, মাহোবা ও কালপী অধিকার করলেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলো মুহম্মদ ঘোরীর। তখন কুতবুদ্দীন আইবেক নিজেকে ভারতের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করলেন।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের এক স্বর্ণালী অধ্যায়ের সূচনা হলো। মুহম্মদ ঘোরীর তারবারিতে তার বিজয়ের সূত্রপাত হলেও এ ধারার শক্ত ভিত রচনা করলেন কুতবুদ্দীন আইবেক। রাজ্য বিজয়ের সাথে মুসলিম শাসনের স্বাধীন সুলতান হিসেবে তাঁর আবির্ভাব তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম তাই আজও চির অম্লান, চির ভাস্বর।

## একুশ

বারোশ' চার খ্রিস্টাব্দ। মার্চের এক আগুন ঝরা দুপুর। কর্মমুখর বাংলার শহর, গ্রাম, জনপদ। কর্মব্যস্ত সকলেই। নদীয়া শহরের দোকানদার, ফেরিওয়ালা, ক্রেতা-বিক্রেতা, কুলি-মজুর প্রত্যেকেই যে যার কাজ করছে। রাজপথে পথচারীরা চলেছে গন্তব্যের দিকে।

হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দ ঃ খট্ খাটটা খট্ খট্। ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে চলেছে সেরেফ সতেরো জন ঘোড়-সওয়ারের একটি দল। ঘোড়ার পায়ের আওয়াষ আরো স্পষ্ট হয়ে আসছে। পথিক পথ পানে চেয়ে থাকে। ভাবে- ঘোড়া ব্যবসায়ী। বোধ হয় রাজ দরবারে ঘোড়া বিক্রিয়ের জন্যে যাচ্ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘোড় সওয়ারের দলটি রাজপুরীর তোরণে উপস্থিত হয়ে আক্রমণ করলো রাজ প্রাসাদ। রাজ অন্তঃপুরের সবাই হতবাক।

'এ কারা? কোথা থেকে, কেমন করে এলো? প্রহরীদের হত্যা করছেই বা কেন?'

আশি বছর বয়সী রাজা লক্ষণ সেন তখন দুপুরের খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। খবর পেয়েই পড়ি মরি করে আসলেন। দেখেই চমকে উঠলেন ঃ

'সর্বনাশ! এ যে মুসলমান! তুর্কি সৈন্য! গণকেরা যার কথা আগেই বলেছিলো। এখন উপায়? উপায় মাত্র একটি, আর তা হলো জীবন নিয়ে পালানো।'

এই ভেবে রাজা লক্ষণ সেন পেছনের দরজা দিয়ে, খালিপায়ে, নৌকাযোগে পূর্ব বাংলায় পালিয়ে এলেন। ইতোমধ্যে তুর্কি সৈন্যের আরো কয়েকটি দল শহরে এসে পৌছালো। সম্পূর্ণ বিনা বাধায় নদীয়ায় সামরিক জয় হলো মুসলমানদের। বাংলায় প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পেলো তারা।

যে কীর্তিমান মুসলিম বীরের নেতৃত্বে এটা সম্ভব হয়েছিলো, তাঁর নাম ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী। বখতিয়ার খলজী নামেই ইতিহাসে যাঁর উজ্জ্বল পরিচিতি।

এরপর বখতিয়ার বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করলেন। এর কিছুটা পরে জয় করলেন বরেন্দ্রভূমি। এভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত উত্তর বঙ্গ অধিকারে এলো তাঁর। রাজ্যভুক্ত হলো নদীয়া, গৌড়, রংপুর ও দিনাজপুর। তিনি গৌড়কে বানালেন বিজিত রাজ্যের রাজধানী। গৌড়ের নামকরণ করা হলো লাখনৌতি।

বখতিয়ার খলজী বাংলার বিজিত অঞ্চলে মুসলিম শাসন কায়েম করেন। সে শাসন ব্যবস্থা ছিলো সামান্তপ্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল খলজী আমীরদের জায়গীর হিসেবে দেয়া হয়। এসব আমীররা এক প্রকার স্বাধীনভাবেই নিজ নিজ জায়গীরের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। বখতিয়ার খলজী মাঝে মাঝে উপঢৌকন পাঠিয়ে সুলতান কুতবুদ্দীন

আইবেককে সন্তুষ্ট রাখতেন। দিল্লীর হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতেন।

বখতিয়ার খলজী ছিলেন ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তাই তিনি রাজ্যের মধ্যে মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। সহায়তা করেন ইসলাম প্রসার ও মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশে।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দ। বর্ষাকাল। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিব্বত অভিযানে বের হলেন বখতিয়ার।

তিব্বত নদী বহুল দেশ। তার ওপর নামলো প্রবল বেগে বর্ষা। এরূপ পরিবেশে তুর্কিরা যুদ্ধে অপটু। তিব্বতীরাও তীব্রবেগে আক্রমণ করলো মুসলিম বাহিনীকে। সে আক্রমণের মুখে টিকতে পারলো না বখতিয়ারের ফৌজ। বাধ্য হয়ে পিছিয়ে এলেন তিনি। ফেরার পথে পড়লেন বিশ্বাসঘাতকতার ছোবলে। তিব্বত যাত্রা পথে কামরূপ রাজার সাথে সন্ধি করেছিলেন তিনি। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করলেন কামরূপ রাজা। রণক্লান্ত সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করে বসলেন তিনিও। শুরু হলো তীব্র লড়াই। প্রাণপনে লড়াই করে বখতিয়ারের জয় হলো বটে, কিন্তু সৈন্য সংখ্যা নেমে এলো অর্ধেকে। ফেরার পথে পড়লো বিশাল নদী। সে নদীতে পারাপারের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। বাধ্য হয়ে তিনি সসৈন্যে ঝাঁপ দিলেন সেই বিশাল স্রোতস্বিনীর বুকে। তুর্কিরা সব সময় সাঁতারে অদক্ষ। তাই ডুবে মরলো প্রায় সব সৈন্য। মাত্র শ' খানেক সৈন্য নিয়ে কোন রকমে দেবকোটে ফিরে এলেন তিনি। এখানে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হলেন এবং এই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হলো।

বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে নেমে আসে সুষ্ঠু নেতৃত্বের সংকট। সিংহাসন লাভের জন্যে আত্মকলহ, ষড়যন্ত্র, শঠতা ও অভ্যন্তরীণ কোন্দোলে লিপ্ত হয় আমীর-ওমরাহরা। ক্ষমতা গ্রহণের জন্যে শুরু হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসা ও কলহ। একজন অন্যজনকে হত্যা করে ক্ষমতায় আসতেও দ্বিধা করেননি। তবে শাসক হিসেবে তাঁরা প্রায়ই স্বাধীন ছিলেন। নামমাত্র তাঁরা দিল্লী সালতানাতের আনুগত্য স্বীকার করতেন।

এমনি অবস্থায় ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনজন খলজী আমীর বাংলার সিংহাসনে বসেন। তাঁরা হলেন ঃ

১. ইযযুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খলজী (১২০৭–১২০৮)

২. হুসাম উদ্দীন ইওয়াজ খলজী (১২০৮–১২১০ ও ১২১৩–১২২৭)

৩. আলী মর্দান খলজী (১২১০–১২১৩)

১২২৭ থেকে ১২৮১ পর্যন্ত সময়টা ছিলো তুর্কি শাসনকাল। এ সময় মোট পনেরো জন শাসক বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সুলতান মুগিসুদ্দীন তুগরীল (১২৬৮–১২৮১)। তিনি পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করে রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করেন। ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার বৃহৎ অংশ মুসলিম শাসনের আওতায় আসে। তিনি সোনার গায়ের অদূরে 'নারিকেল্লা' নামে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেন।

চৌদ্দ শতকের প্রথম পাদ। তখনো বাংলার অনেক জায়গা মুসলিম শাসনের বাইরে। মুসলিম শাসনের বাইরে ছিলো বাংলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সিলেটও। তখন সিলেটের নাম ছিলো শ্রীহট্ট। আর এর রাজা ছিলো গৌর গোবিন্দ। সে ছিলো অত্যন্ত অত্যাচারী ও কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী। তার নির্মম নির্যাতনের ভয়ে শ্রীহট্টের সংখ্যালঘু মুসলমানরা ভয়-বিহ্বল থাকতো সব সময়। ইসলামের সব বিধি-বিধান পালন করতে পারতো না তারা। পারতো না গরু কুরবানি করতেও। কঠোর নিষেধ ছিলো রাজা গৌর গোবিন্দের।

কিন্তু গৌর গোবিন্দের এ কঠোর আদেশ মানতে পারেনি শ্রীহট্টের বুরহানুদ্দীন নামের এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান। সে তার শিশু পুত্রের আকিকা উপলক্ষ্যে একটি গরু কুরবানী করে। খুব গোপনে। বাড়ির ভেতরে। তারপর বাড়ির ভেতরেই প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করলো সে গোশত। আর তখনই ঘটলো এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। এক কাক এসে এক টুকরো গোশত নিয়ে উড়ে গেলো। তারপর সে গোশতের টুকরোটি নিয়ে ফেললো গৌর গোবিন্দের রাজ প্রাসাদের কাছেই। যা সহজেই চোখে পড়লো রাজবাড়ির লোকদের। তারা গোশতের টুকরোটি নিয়ে দেখালো রাজা গৌর

গোবিন্দকে। দেখেই জ্বলে উঠলো রাজার শরীর। চোখ নিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগলো তার। সে উত্তেজিত হয়ে কর্মচারীদের আদেশ দিলো ঃ

'কার এতোবড় বুকের পাটা যে আমার রাজ্যে গো হত্যা করে? কে সেই মহাপাপী? কে সেই নেড়ে মুসলমান? তাকে এক্ষুণি খুঁজে বের করো। সেই নরাধমকে উপযুক্ত শাস্তি না দেয়া পর্যন্ত আমি জল পর্যন্ত স্পর্শ করবো না।'

রাজার আদেশ পেয়ে কর্মচারীরা খুঁজতে লাগলো। মুসলিম পল্লীর বাড়ি বাড়ি। অবশ্য তাদের বেশি বেগ পেতে হলো না। অল্পক্ষণের মধ্যে বুরহানুদ্দীনকে খুঁজে বের করলো তারা। তারপর তাকে বেঁধে নিয়ে হাজির করলো রাজার সামনে। গৌর গোবিন্দ তাকে দেখে একেবারে গর্জে উঠলো ঃ

'ও তুই সেই পাপিষ্ঠ? তুই কোনো সাহসে আমার রাজ্যে গো হত্যা করলি? তুই কী জানিস না আমার রাজ্যে গো হত্যা নিষেধ।'

'মহারাজ! আমি ইচ্ছে করে গরু কুরবানি করেনি। এটা না করে আমার উপায় ছিলো না। কারণ আমি একটি পুত্র সন্তান লাভের আশায় আল্লাহর নামে একটি গরু কুরবানির মানত করেছিলাম। আল্লাহ্ আমার সে আশা পূর্ণ করেছেন। তাই মানত পরিশোধ করতে আমি তাঁর নামে গরু কুরবানি করেছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।' কাতর কণ্ঠে আবেদন জানালো বুরহানুদ্দীন।

কথাগুলো শুনে গৌর গোবিন্দ আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সাথে সাথে ডাকলো প্রহরীকে। আদেশ দিলো ঃ

'যে শিশুর জন্যে এতোবড় পাপানুষ্ঠান, তাকে এক্ষুণি আমার সামনে হাজির করো। তারপর তাকে দেবতার সামনে দ্বিখণ্ডিত করো।'

রাজার আদেশে বুরহানুদ্দীনের শিশু পুত্রকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে রাজার সামনে হাজির করা হলো। তারপর তীক্ষ্ম তরবারি দিয়ে দেবতার সামনে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হলো। এই নির্মম দৃশ্য দেখার আগেই বুরহানুদ্দীন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো। এবার নর পিশাচ গৌর গোবিন্দ বুরহানুদ্দীনের একটি হাতও কেটে নিলো।

বুরহানুদ্দীন অজ্ঞান অবস্থায় অনেকক্ষণ মাটিতে পড়ে রইলো। যখন তার একটু জ্ঞান ফিরলো, তখন সে শুধু বলে উঠলো ঃ

'হে আল্লাহ! তুমি এই অত্যাচারী মহাপাপীর হাত থেকে এ দেশের মুসলমানদের উদ্ধার করো।'

বুরহানুদ্দীনের কয়েকজন প্রতিবেশী তার সাথে রাজদরবারে গিয়েছিলো। কিন্তু তারা ছিলো নীরব দর্শক। গৌর গোবিন্দের অমানুষিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো শক্তি ও সাহস তাদের ছিলো না। এখন তারা সবাই মিলে ধরাধরি করে বুরহানুদ্দীনকে বাড়ি নিয়ে এলো। প্রতিবেশীরা সবাই ছুটে এলো। কিন্তু তাতে কী আর পুত্র শোকের আগুন প্রশমিত হয়।

দিন যায়। বুরহানুদ্দীনের মনে সব সময় জ্বলতে থাকে পুত্র শোকের আগুন। সেসব সময় চিন্তা করে, কিভাবে পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নেয়া যায়। কার সাহায্যে মহাপাপী গৌর গোবিন্দকে সমুচিত শাস্তি দেয়া যায়।

তখন বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১–১৩১২)। তিনি দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর (১২৮৬–১৩১৬) অধীনস্থ বাংলার বিজিত অঞ্চলের শাসক। সুবর্ণ গ্রাম তাঁর রাজধানী। বুরহানুদ্দীন একদিন সুবর্ণ গ্রামে সুলতান ফিরোজ শাহের দরবারে হাজির হলো। তার প্রতি গৌর গোবিন্দের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়ে বিচার প্রার্থনা করলো সুলতানের কাছে।

সুলতান ফিরোজ শাহ গৌর গোবিন্দের অত্যাচারের কথা শুনে ভীষণ দুঃখিত ও রাগান্বিত হলেন। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চাইলেন তিনি। ডাকলেন সেনাপতি সেকান্দার খানকে। আদেশ দিলেন গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার।

সুলতানের আদেশ পেয়ে সেকান্দার খান সসৈন্যে যাত্রা করলেন। ধূর্ত গৌর গোবিন্দ বুঝলো, সম্মুখ সমরে মুসলমানদের কাছে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। তাই সে অপকৌশলের আশ্রয় নিলো। প্রভাব খাটালো যাদুবিদ্যার। ফলে সেকান্দার খান বিফল হয়ে ফিরে এলেন।

এ সময় হযরত শাহ জালাল (রহ.) সোনার গাঁও-এ ইসলাম প্রচার করছিলেন। সেকান্দার খান গেলেন তাঁর কাছে। এই মহান দরবেশের দোয়া ও সাহায্য প্রার্থী হলেন তিনি।

হযরত শাহ জালাল (রহ.) তিনশ' ষাটজন শিষ্য নিয়ে অংশ নিলেন জিহাদে। আসার পথে সামনে পড়লো বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদী। কিন্তু নদীতে পারাপারের কোনো ব্যবস্থা নেই। মুসলিম দরবেশের আগমন সংবাদ পেয়ে গৌর গোবিন্দ আগে থেকেই খেয়া পার বন্ধ করে দিয়েছে। তবু ভয় পেলেন না শাহ জালাল (রহ.)। হরিণের চামড়ার জায়নামায খানা নদীর বুকে বিছালেন তিনি। তারপর তিনশ' ষাটজন শিষ্যসহ উঠলেন তাতে। অনায়াসে পার হলেন সেই তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ ব্রহ্মপুত্র নদী।

এ সংবাদ শুনে গৌর গোবিন্দ অত্যন্ত অবাক ও নিরাশ হলো। মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হবার আর কোনো আশাই রইলো না তার। তাই সে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেলো। কোথায় তা কেউ জানলো না।

শ্রীহট্ট মুসলিমদের করতলগত হলো (১৩০৩ খ্রি.)। এর নাম রাখা হলো সিলেট। সেকান্দার খান নিযুক্ত হলেন সিলেটের প্রথম মুসলিম শাসক। শাহ জালালের নির্দেশে তিনি এখানে ইসলামী শাসন কায়েম করলেন। তিনিও আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি লাভ করেন। পরিচিত হন সেকান্দার শাহ (রহ) নামে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলার দক্ষিণ অংশ। ইসলামের আলো নিয়ে এলেন এক আধ্যাত্মিক সাধক।। নাম তাঁর হযরত খান জাহান আলী (রহ.)।

তিনি প্রথম জীবনে দিল্লীতে তুঘলক সেনা বাহিনীতে সেনাপতির পদে চাকরি করতেন। পরে এ পদ ছেড়ে দিয়ে ইসলাম প্রচারের জন্যে বাংলাদেশে আসেন। সাথে নিয়ে আসেন বহু লোক-লস্কর ও সৈন্য সামন্ত। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন। গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত সুন্দরবন অঞ্চল তিনিই প্রথম আবাদ করেন এবং

সে রাজ্যের নাম রাখেন 'খলিফাতাবাদ'। তখন বাংলার সুলতান ছিলেন নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩৫–১৪৬০ খ্রি.)। খান জাহান আলী সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে এ অঞ্চল শাসন করতেন। বর্তমান খুলনা, যশোরের কিছু অংশ, বরিশাল, পিরোজপুর ও সাতক্ষীরা জেলা খান জাহানের রাজ্যভুক্ত ছিলো। এভাবে গোটা বাংলাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম হলো, ধীরে ধীরে।

ষোলো শতকের দ্বিতীয় দশক। বাংলার সিংহাসনে সুলতান নসরত শাহ্। দিল্লীর সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদীর সাথে পানিপথে যুদ্ধ (১৫৬২ খ্রি.) হলো মুঘল বীর যহীরুদ্দীন মুহম্মদ বাবুরের। এ যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদী পরাজিত ও নিহত হলেন। ফলে উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের পট পরিবর্তন হলো। সুলতানী যুগের অবসান ঘটলো। শুরু হলো মুঘল আমল। তখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ মুঘল– অধিকার মুক্ত ছিলো। তারপর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হলো এ দেশ। বাংলার সুলতান তখন দাউদ খান কররানী (১৫৭৩–১৫৭৬ খ্রি.)। তিনি ছিলেন খুব স্বাধীনচেতা ও উচ্চাভিলাষী সুলতান। মুঘল সম্রাট আকবরের আনুগত্য অস্বীকার করলেন তিনি। খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করলেন নিজের নামে। ফলে সম্রাট আকবর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান পাঠালেন। রাজমহলের যুদ্ধে (১৫৭৬ খ্রি.) দাউদ মুঘল বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো বাংলাদেশ। তখন থেকে মুঘলদের নির্বাচিত সুবেদার ও নবাবরা বাংলাদেশের শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে, ধীরে ধীরে। সেই সুযোগে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খান (১৭১৭–১৭২৭ ক্রি.) মুঘল শাসন থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করেন এবং স্বাধীন নবাব হিসেবে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তখন থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পর পর চারজন স্বাধীন নবাব বাংলার শাসন কার্য পরিচালনা করেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজ ও দেশীয় কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পরে নিহত হন। ফলে বাংলার মুসলিম শাসনের পতন ঘটে।

# বাইশ

বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশের বর্ণ হিন্দুরা মুসলিম শাসন কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা মুসলিম শাসন ও সংস্কৃতি সমূলে ধ্বংস করার জন্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী নীরবে কাজ করেছে। রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদগুলোতে তারাই অধিষ্ঠিত ছিলো বলে যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই গোটা ভারতবর্ষে রামরাজ্য কায়েম করতে চেয়েছে। পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় হিন্দু জমিদার গণেশের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে শ্রীচৈতন্যের ধর্মীয় আন্দোলন তাদের এ প্রচেষ্টারই নামান্তর।

অবশেষে, তারা এ প্রচেষ্টায় পূর্ণ সাফল্য অর্জন করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে। এ দেশের শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে তুলে নিয়ে। তাই তো আধুনিক হিন্দু ঐতিহাসিক তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'ষড়যন্ত্রটা আসলে হিন্দুদেরই ষড়যন্ত্র।.....হিন্দুদের চক্রান্ত হলেও বড় গোছের মুসলমান তো অন্তত একজন চাই। নইলে সিরাজুদ্দৌলার জায়গায় বাংলার নবাব হবেন কে? ক্লাইভ তো নিজে হতেই পারেন না। হিন্দু গভর্ণরও কেউ পচ্ছন্দ করবেন কি-না সন্দেহ। ..... জগৎ শেঠরা তাদেরই আশ্রিত ইয়ার লতিফ খাঁকে সিরাজুদ্দৌলার জায়গায় বাংলার মসনদে বসাতে মনস্থ করেছিলেন। উমিচাঁদেরও এতে সায় ছিল। কিন্তু ক্লাইভ ঠিক করলেন অন্য রকম।..... ক্লাইভ মনে মনে মীর জাফরকেই বাংলার ভাবী নবাব পদের জন্য মনোনীত করে রেখে ছিলেন।' (তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় ঃ পলাশীর যুদ্ধ, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৫৩, পৃ. ১৫৮−১৫৯)

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন। বৃহস্পতিবার। প্রভাবশালী হিন্দু ও ইংরেজ বেনিয়াদের সম্মলিত ষড়যন্ত্রে সামরিক বিপর্যয় ঘটলো পলাশীতে। যার পরিণতিতে বাংলার সাড়ে পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসনের অবসান হলো।

শুধু তাই নয়, এই বাংলা থেকেই শুরু হলো ইংরেজ বেনিয়াদের গোটা ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের অশুভ আয়োজন। অবশেষে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তারা সর্বশেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে সারা ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম করে।

বৃটিশ শাসনের শুরু থেকেই রাজ্যহারা মুসলমানদের জীবনে নেমে এলো এক কালো অধ্যায়। তাদের আর্থিক, সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেখা দিলো চরম দুর্গতি ও বিপর্যয়। ইংরেজও তাদের সহযোগীদের রোষাণলে পড়লো মুসলিম জাতি।

এমনি অবস্থায় এদেশের মুসলমানদের সামনে মাত্র দু'টো পথই খোলা ছিলো– শোষণ-নির্যাতন নীরবে সহ্য করা অথবা বিদ্রোহ-বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণ-নিপীড়নের উচ্ছেদ করা। মুসলমানরা দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিলো। শুরু হলো ইংরেজ বিতাড়নের সংগ্রাম।

পলাশীর যুদ্ধের পরের বছরই অর্থাৎ ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর শাহজাদা দ্বিতীয় শাহ আলম বাংলা ও বিহার আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে বের হন এবং বিহার আক্রমণ করেন। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণিয়ার খাদিম হোসেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এ বছরই বাংলার পীর–ফকিররা শুরু করেন আর একটি সশস্ত্র সংগ্রাম। ইতিহাসে তা ফকির আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ফকির আন্দোলন শুরু হয় এবং তা ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফকির আন্দোলনের প্রধান নেতা ও সংগঠক ছিলেন মজনু শাহ।

তাঁর নেতৃত্বে এ আন্দোলন সারা বাংলাব্যাপী প্রবল আকার ধারণ করে। রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, ঢাকা ও ময়মনসিংহে ফকিরদের ব্যাপক তৎপরতায় কেঁপে ওঠে বৃটিশ রাজ তখ্‌ত। বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে ছিলো ফকিরদের দুর্গ বা সেনানিবাস।

১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মজনু শাহের ফকির দলের সাথে ইংরেজদের অনেক খণ্ড যুদ্ধ হয়। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে মজনু শাহের

বাহিনী ইংরেজ শক্তিকে পরাজিত করে ঢাকা দখল করেন এবং দেশের পতাকা তোলেন।

'১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে লেফটেন্যান্ট টেলর পরিচালিত বৃটিশ বাহিনীকে মজনু শাহের দল পরাজিত করে। লে. রবার্টসন ও তার সুদক্ষ বাহিনীকেও ভীষণভাবে পরাজিত করে মজনু শাহের বাহিনী এবং রবার্টসন এ সময় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটে ১৭৭৬ সালের ১৪ নভেম্বরে। দশ বছর পর ১৭৮৬ সালের ২৯ নভেম্বর লেফটেন্যান্ট রোমান এর নেতৃত্বে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে মজনু শাহের বাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই হয়। উভয় পক্ষেই বহু নিহত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেকের মতে বৃটিশরা তাদের বৃটিশ পলিসি প্রয়োগ করে কিছু সন্ন্যাসীকে বিপ্লবী ফকির দলে ঢুকিয়ে দেয়। সেই হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকিরদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। বৃটিশরা ফকির বাহিনীর গোপন ঘাঁটি ও গোপন বিষয়ের খবর পেয়ে যায়। তারপরেই মজনু শাহের বাহিনীকে পরাজিত ও ধ্বংস হতে হয়।' (গোলাম আহমদ মোর্তজা, 'এ সত্য গোপন কেন?', পৃ. ১১)

কালেশ্বরের যুদ্ধে মজনু শাহ পরাজিত ও আহত হয়ে আত্মগোপন করেন। ১৭৮৭ সালের মার্চ মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। মজনু শাহের দলে ইংরেজদের চক্রান্তে হিন্দু সন্ন্যাসীদের প্রবেশের ফলেই মজনু শাহের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে এবং ফকির আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। সন্ন্যাসীদের আগমনের ফলে ফকিরদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিবাদ দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত আন্দোলন ব্যর্থ হয়। কলিকাতা সিটি কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামী অধ্যাপক শ্রীশান্তিময় রায় তাঁর 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও মুসলিম অবদান' বইয়ে লিখেছেন ..... কিন্তু এই সময়ে (সন্ন্যাসীদের আগমনের পর) ফকির ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১১)

মজনু শাহের মৃত্যুর পর ফকির আন্দোলনে সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব দেখা দিলেও দলের অন্যান্য নেতা কর্মীরা এ আন্দোলন আরও অনেক দিন (১৮০০ খ্রি.) পর্যন্ত চালিয়ে যান।

মহীশূর রাজ্য– অধিপতি হায়দার আলী। স্বদেশ প্রেমের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। চাইলেন ইংরেজদের তাড়িয়ে স্বদেশে স্বাধীনতার ফুল ফুটাতে।

এ উদ্দেশ্যে তিনি নিযাম ও মারাঠাদের পক্ষে আনার চেষ্টা করলেন। তিনি তাদেরকে বুঝালেন এই বলে ঃ 'আমরা যে যেখান থেকেই আসি না কেন ভারতকে নিজের মাতৃভূমি রূপে বরণ করে নিয়েছি– হিন্দু, মুসলমান, শিখ, মারাঠা সবাই আমরা ভারতবাসী, ভাই ভাই। (গোলাম আহমাদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস', পৃ. ২০১)

হায়দার আলীর এ যুক্তিপূর্ণ কথায় কাজ হলো। তাঁর পক্ষে এলেন নিযাম ও মারাঠারা। এরপর হায়দার আলী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত শক্তি নিয়ে ইংরেজদের মুখোমুখি হলেন তিনি। আর তখনই বিশ্বাসঘাতকতা করলেন নিযাম ও মারাঠারা। হায়দারের পক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন তারা। ফলে হায়দারকে একাই লড়তে হলো ইংরেজদের বিরুদ্ধে। তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে মাদ্রাজের দ্বার পর্যন্ত পৌছে গেলেন। তাঁর শক্তি ও সাহসিকতা দেখে ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হলো ইংরেজদের মনে। সন্ধির প্রস্তাব দিলো তারা। এ সময় মারাঠাদের তরফ থেকেও মহীশূর আক্রান্ত হবার আশঙ্কা করলেন হায়দার আলী। তাই তিনি সন্ধি করলেন ইংরেজদের সাথে। চুক্তি হলো ঃ 'অন্য কোনো শক্তি হায়দারকে আক্রমণ করলে ইংরেজরা তাঁকে সাহায্য করবে।'

হায়দার আলীর অনুমানই সঠিক ছিলো। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে মারাঠারা আক্রমণ করলো মহীশূর। কিন্তু এবার বিশ্বাসঘাতকতা করলো ইংরেজরা। সন্ধির শর্তানুযায়ী হায়দারকে সাহায্য করলো না তারা। বরং উল্টো রুখে দাঁড়ালো তাঁর বিরুদ্ধে। হায়দার তখন একাই বীর বিক্রমে মোকাবিলা করতে এগিয়ে গেলেন। যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন ইংরেজদের।

কিন্তু এই বীরত্ব প্রদর্শনের সৌভাগ্য হায়দারের বেশি দিন হলো না। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন তিনি। দিন দিন স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যেতে লাগলো তাঁর। অবশেষে, ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করলেন তিনি।

হায়দার আলীর মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য পুত্র টিপু মহীশূরের শাসনভার গ্রহণ করলেন। পরিচিত হলেন টিপু সুলতান নামে। তিনিও পিতার মতো যোগ্য, সাহসী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। ইংরেজদের ভারত ছাড়া করার পবিত্র বাসনা ছিলো তাঁর মনেও।

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তিনি। ইংরেজরাও বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলো। শুরু হলো ভীষণ যুদ্ধ। বৃটিশ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। টিপু সুলতান ইংরেজ সেনাপতি মেথিউ কে সসৈন্যে বন্দী করলেন। বেদনোর ও ম্যাঙ্গলোর অধিকারে এলে তাঁর। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা টিপুর সাথে সন্ধি (১৭৮৪ খ্রি.) করতে বাধ্য হলো।

ইংরেজদের ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তারের পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ালেন টিপু সুলতান। তাই তারা চাইলো এ বাধার প্রাচীর সরিয়ে ফেলতে। ভারতীয় দোসরদের সাথে নিয়ে আবারও যুদ্ধের আয়োজন করলো তারা। ফলে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হলো চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ। টিপু সুলতান স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর ওপর। কিন্তু ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে পেরে উঠলেন না। যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন তিনি ও তাঁর বীর সেনারা।

## তেইশ

মানুষ সৃষ্টির সূচনা পর্ব থেকেই দু'টো ধারা চির বহমান ঃ সত্যের আলোকিত পথ, অন্যটি মিথ্যার কালো অন্ধকার। সত্যের কাছে মিথ্যা পরাজিত হয় ঠিকই কিন্তু তার অশুভ শক্তি যেনো শেষ হতে চায় না। জিইয়ে থাকে, যুগ যুগান্তরে তা আবার শক্তি সঞ্চয় করে বেরিয়ে আসে। সত্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস রক্তাক্ত। সেই রক্ত ভেজা পথে সত্যের আলো আসে ঠিকই কিন্তু সময়ের পরিসরে মানুষ যখন আল্লাহর বিধান ভুলে গিয়ে নিজের বানানো পথে চলতে থাকে তখনই আবার আসে মিথ্যা ও

জাহেলিয়াতের মত, পথ, চেতনা এবং এ ভাবনার মানুষ। এই উপমহাদেশে বার বারই ইসলামের বিজয় এসেছে, মহাপ্রভুর বিধান চালু হয়েছে বিজিত জনপদে কিন্তু তা দীর্ঘদিন টিকে থাকেনি। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ দিকটার পরিণতি এমনই হয়েছিলো। সম্রাট– শাসকদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা, গৃহবিবাদ, ভোগ বিলাস ও দূরদুর্শিতার অভাবে তারা ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলো। তাই তো এক এক করে মুঘল সাম্রাজ্যের এক-একটি অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলো। গোড়াতেই বাংলায় এই বিপর্যয় ঘটে। মুর্শিদকুলী খাঁর গড়া বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসন সিরাজউদ্দৌলার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলো ইংরেজ। ষড়যন্ত্র-শঠতার সাথে যোগ হলো পলাশীর যুদ্ধের অভিনব পরাজয়। এরপর মহীশূর, তাঞ্জোর, সুরাট, কর্ণাট, কটক, অযোধ্যা, পাঞ্জাব, সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, উদয়পুর, হায়দারাবাদ– সবই বৃটিশ শাসনের ভেতর চলে আসে। মুসলিম শাসনের অন্তিম পরিণতি ঘটলো ১৮৫৭ সালে, মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের অসহায় পরাজয়ে। তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির মাধ্যমেই এ উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের শক্ত ভিত তৈরি হলো। এই অবক্ষয় ও পতনের সময়টা প্রায় একশ' বছর [১৭৫৭–১৮৫৭ খ্রি. পর্যন্ত]। পরাজিত, অবহেলিত মুসলিমরা কিন্তু এ সময়ে একেবারে চুপচাপ বসে থাকেনি। তাদের সংগ্রাম ছিলো অবিরাম, স্বাধিকার চেতনায় তাদের দীপ্ত হৃদয় ছিলো অনির্বাণ। মুক্তির পথে এসেছে বাধা, এসেছে প্রতিরোধ, রক্তপিচ্ছিল হয়েছে তাদের সংগ্রামের স্বচ্ছ সরণী। কিন্তু তারা পুরোপুরি সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মদ্বন্দ্ব ও স্বার্থপরতা মুক্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, বার বার। উনিশ শতকের শুরু থেকেই তারা ধীরে ধীরে সুগঠিত হতে থাকে। এ সময় ইসলামী জীবন বোধের সঞ্জীবনী চেতনায় দীক্ষা দেন এক আলোকিত পুরুষ। নাম সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র.)। তাঁর সংগ্রামী পতাকাতলে হাজির হলো লাখো মুসলিম। ইসলামের চিরায়ত ধ্বনি উচ্চারিত হলো ঃ আল্লাহু আকবর।

১৭৮৬-তে এলাহাবাদের এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে সৈয়দ আহমদ

বেরেলভীর জন্ম। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ ইরফান। চার বছর বয়সে সমকালীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রথা অনুসারে সৈয়দ আহমদকে মকতবে পাঠানো হয়। কিন্তু বাল্যে লেখাপড়ার প্রতি তাঁর কোনো মনোযোগ ছিলো না। পরে অবশ্য তিনি আরবি, ফারসি প্রভৃতি বিষয়ে বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

আঠারো বছর বয়সে সৈয়দ আহমদ দিল্লী যান। সে সময়ে দিল্লী ছিলো ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রভূমি। এখানে তিনি শাহ আব্দুল আজিজ দেহলবীর (রা.) শিষ্যত্ব বরণ করেন। আব্দুল আজিজ আকবরাবাদী মসজিদে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর শিক্ষার জন্যে তাঁর যোগ্য পুত্র আব্দুল কাদিরকে নিযুক্ত করেন। এখানে পাঁচ বছর গভীর জ্ঞান অনুশীলনের পর তিনি জন্মস্থান বেরেলীতে ফিরে আসেন।

তখন ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সব মানুষ, বিশেষ করে মুসলমানরা। এজন্যে ইংরেজদের প্রতি ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি। তিনি চাইলেন ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে। যেখানে ইসলামী শাসন পুরোপুরি চালু হবে।

এই উদ্দেশে রোহিলা সরদার আমীর খানের সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন তিনি। তাঁর ইচ্ছা ছিলো আমীর খানকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে তাঁর সহায়তায় একটি মুজাহিদ বাহিনী গঠন করবেন। যুদ্ধ করবেন বিদেশী বেনিয়াদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁর সে আশা অপূর্ণই রয়ে গেলো। আমীর খানও শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের হাতে হাত মিলালেন। সন্ধি করলেন তাদের সাথে। এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন সৈয়দ আহমদ। তার কাছ থেকে চলে গেলেন তিনি।

তখন মুসলিম সমাজ ছিলো নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। পীর পূজা, কবর পূজার মতো শিরককে মুসলমানরা লালন করতো মনে প্রাণে। তারা ভাবতো কবরবাসী পীর সাহেবই তাদের সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এই অন্ধতা ও কুসংস্কারে তারা দুর্বল হয়েছিলো। কবরবাসী কোনো মানুষ তাদের পথ দেখাতে পারেন– এই অপবিশ্বাস তাদের মুক্ত চিন্তার পথ রুদ্ধ

করেছিলো। এ পথ থেকে সংগ্রামের নতুন মিছিলে তাদের নিয়ে এলেন তিনি। সংগঠিত করলেন।

প্রথমে সৈয়দ আহমদ রোহিলা খণ্ডের জায়গীরদার ফয়েজ উল্লাহ্ খানের এলাকায় এ ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর চেষ্টা বিফল হলো না। বিপথগামী মুসলিমরা দলে দলে ফিরে এলো ইসলামের পথে।

সৈয়দ আহমদের লক্ষ্য ছিলো এই উপমহাদেশে ইসলামী শাসন কায়েম করা। তাই তিনি মুসলমানদের মধ্যে জিহাদী প্রেরণা জাগাতে লাগলেন। সফর করতে লাগলেন বিভিন্ন জায়গায়। তিনি রোহিলাখণ্ড থেকে অযোধ্যায় গেলেন। সেখান থেকে টংকে। টংক থেকে দিল্লীতে। জিহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে লাগলেন লোকদের। এ সময় মাওলানা ইসমাইল ও মাওলানা আব্দুল হাই শরিক হলেন তাঁর জিহাদী আন্দোলনে।

১৮২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাওলানা ইসমাইল ও মাওলানা আব্দুল হাইকে সাথে নিয়ে দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যের নিযামের রাজ্যে যান। তারপর পাটনা থেকে কোলকাতা ও বাংলদেশ সফর করেন। বাংলাদেশ থেকেও অনেকে যোগ দেন তাঁর দলে। তাঁদের মধ্যে মৌলভী ইমামুদ্দীন, জহুরুল্লাহ, লুৎফুল্লাহ, তালেবুল্লাহ, ফয়েজউদ্দীন ও কাজী মদনীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সঙ্গী সাথীদের নিয়ে হজ্জে গমন করেন। এ সময় তাঁর সফর সঙ্গীদের সংখ্যা এতো বেড়ে যায় যে, তাদের জন্যে তাঁকে এগারোটি জাহাজ ভাড়া করতে হয়।

মক্কায় হজ্জ সমাপনের পর তিনি মদীনায় রাসূলের (সা.) রওজা মোবারক যিয়ারত করলেন।

তারপর দামেশক, জেরুজালেম, তুরস্ক সফর করলেন। এভাবে তিন বছর ধরে বিভিন্ন স্থান সফর করে তিনি জন্মভূমি রায় বেরেলীতে ফিরে এলেন। থাকলেন কিছু দিন। জিহাদের প্রশিক্ষণ দিলেন মুরীদদের।

এ সময় পাঞ্জাবে শিখ রাজা রণজিৎ সিংহের শাসন চলছিলো। শিখেরা মুসলমানদের ওপর ভীষণ অত্যাচার চালাতো। তারা মুসলিমদের ধর্ম কর্মে

বাধা দিতো। তাদের অত্যাচারের ভয়ে মুসলমানরা গরু কোরবানী করতেও পারতো না। এ সময়কার শিখদের অত্যাচারের করুণ দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে শাহ আব্দুল আজিজ দেহলবীর (র.) কয়েকটি পত্রে। আরবি ভাষায় লেখা এসব পত্রের এক টুকরো বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

১.

'আমার এ অপলক চোখে
আমি দেখি,
ক্ষমতায় আসীন যেসব অবিশ্বাসী
তারা করেছে ধ্বংস, লুট–
কাবুল থেকে দিল্লী, এক বিস্তীর্ণ জনপদ,
হে খোদা, তুমি প্রতিশোধ নাও।
পাষণ্ড-বর্বর শিখ ও মারাঠাদের ওপর
নেমে আসুক, এক্ষুণি নেমে আসুক,
তোমার নির্মম প্রতিশোধ।
অগণন, অসহায় মানুষকে হত্যা করেছে ওরা,
তাদের ঠেলে দিয়েছে দুঃখ-দুর্দশার গভীরে,
কেউ পায়নি রেহাই ওদের রক্তমাখা হাত থেকে।
----- ----- ----- -----।'

২.

'শীত আসছে,
আর শিখদের ভয়ে তাই মানুষ জড়ষড়, সন্ত্রস্ত,
আতঙ্কিত সবাই। যা নির্ভেজাল-নিষ্ঠুর সত্য।
হে দয়ালু খোদা,

এ আবেদন শোন– এ শহর থেকে ওদের
হটিয়ে দাও।
ওরা জঘন্য, বর্বর শত্রু,
ওদের হাত থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো,
নিরাপদ করে দাও এক একটি মানুষের
দুর্লভ জীবন।'

### ৩.

বর্বর শিখদের বাহাদুরীতে
নগর জীবন আজ অস্থির, ছন্নছাড়া, বিশৃঙ্খলা।
শিখেরা করেছে কতো কিছুই
হাতে মাপা খাবার দিয়েছে, শান্তিময় শহরে
নিশ্চিহ্ন করেছে,
অবরোধ করেছে দুর্গ ও প্রাসাদ
ঘর থেকে নিরন্ন, অসহায় বাসিন্দাদের টেনে
বের করে।
একে একে হত্যা করেছে।
লুট করেছে সম্পত্তি,
ওদের হাতে বন্দী হয়েছে অসহায় নারী।
----- ----- ----- -----।'
খোদার কাছে তাদের বিরুদ্ধে জানাই নালিশ।'

(শাহ আব্দুল আজিজ দেহলবীর (রহ.) তিনটি কবিতা, অনুবাদক ঃ এস, এম, হারুন-উর-রশীদ, মাসিক মদীনা, সংখ্যা ঃ ৫ম, ১৯৯৯)

সৈয়দ আহমদ শিখদের জুলুম-অত্যাচারের কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন তিনি।

১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে মাত্র পাঁচশ' সঙ্গী নিয়ে রওনা হলেন তিনি। প্রথমে গেলেন টংকে। সেখানকার নবাব ছিলেন আমীর খানের পুত্র। তিনি সৈয়দ সাহেবকে ভালোবাসতেন। তাঁর যুদ্ধ যাত্রার কথা শুনে তিনি তাঁকে সিন্ধুর খয়েরপুরে যাবার পরামর্শ দিলেন। সৈয়দ সাহেব খয়েরপুরে গিয়ে মীর রুস্তম আলীর সাহায্যও পেলেন। সেখান থেকে তিনি এলেন পেশোয়ারে। সে সময় পেশোয়ারের গভর্ণর ছিলেন ইয়ার মোহাম্মদ খান। তিনি শিখ রাজা রণজিৎ সিংহের অধীনতা মেনে নিয়েই গভর্ণর পদ লাভ করেন। এই কারণে তাঁর কাছে জিহাদের চেয়ে পার্থিব পাওয়াটাই বড় হয়ে উঠলো। তিনি সৈয়দ সাহেবের ডাকে সাড়া দিলেন না, বরং উল্টো রণজিৎ সিংহকে জানিয়ে দিলেন সবকিছু সবিস্তরে।

রণজিৎ সিংহ তখন বুধ সিংহের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠালেন সৈয়দ আহমদকে দমন করার জন্যে। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর শিখ বাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো মুসলিম মুজাহিদদের ওপর। মুসলিম বাহিনীও বীর-বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শিখ সৈন্যদের ওপর। চললো প্রচণ্ড লড়াই। শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীর কাছে শিখ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। মুসলিম বাহিনী পেশোয়ার দখন করলো। ইসলামী শাসন কায়েম করা হলো সেখানে।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদের বাহিনী শিখদের আর একটি প্রচণ্ড আক্রমণের মুখোমুখি হলেন। এতেও বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করে জয়ী হলো মুসলিম বাহিনী। ১৮৩০- এর জুন মাসে জেনারেল অলার্ড ও হরি শিং নালওয়ার অধীনস্থ শিখ বাহিনী আবারও আক্রমণ করলো মুসলিম বাহিনীকে। প্রথমে পরাজিত হলেও শেষ পর্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হলেন মুসলিমরা।

এভাবে সৈয়দ আহমদ তাঁর মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে একের পর এক অত্যাচারী শিখদের মোকাবিলা করতে লাগলেন। পরাজিত হতে লাগলো তারা প্রতিটি

যুদ্ধে। এতে রণজিৎ সিং সম্মুখ সমরে মুসলমানদের মোকাবিলা করার সাহস হারিয়ে ফেললেন। তাই শঠতার আশ্রয় নিলেন তিনি। বিভিন্ন এলাকার মুসলিম উপজাতীয় নেতাদের কাছে লোক পাঠালেন। এসব নেতারা সৈয়দ আহমদ ও তাঁর জিহাদী আন্দোলন সম্পর্কে নানা রকম অপপ্রচার চালাতে লাগলো। রণজিৎ সিংহের পয়সা খেয়েই এমন জঘন্য অপপ্রচার চালাচ্ছিলো তারা। ফলে জিহাদ সম্পর্কে অনেক মুসলমানেরই ধারণা পাল্টে যায়।

মুসলিম মুজাহিদের সংখ্যা তখন প্রায় চল্লিশ হাজার। একদিন সৈয়দ আহমদ পাঞ্জাব থেকে কাশ্মীর যেতে চাইলেন। স্বল্প সংখ্যক মুজাহিদ নিয়ে রওনা হলেন তিনি। পথে পড়লো পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের সীমানা বালাকোটের প্রান্তর। তিনি সাথীদের নিয়ে তাঁবু খাটালেন সেখানে। এদিকে রণজিৎ সিংহের একদল সৈন্য ছিলো কাছের মাটিকোট ময়দানে। সে দলের অধিনায়ক ছিলো গোপাল সিং। সে সৈয়দ সাহেবের অবস্থানের খবর জানতো না।

এ সময় এক পাঞ্জাবী মুসলমান পুরস্কারের আশায় সৈয়দ সাহেবের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিলো তাকে। ফলে গোপাল সিংহের অধীনস্থ শিখ সৈন্যরা হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো মুজাহিদদের। যাঁরা এই হামলা সম্পর্কে একেবারেই সজাগ ছিলেন না। মাত্র কয়েকজন মুজাহিদ ছিলেন সৈয়দ সাহেবের সাথে। তবু এই আকস্মিক আক্রমণে ভয় পেলেন না তিনি। যুদ্ধ করতে লাগলেন প্রাণপণে। বন্দুকে কার্তুজ ভরে অবিরাম গুলি চালাতে লাগলেন শত্রু বাহিনীর ওপর। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কতক্ষণ আর লড়বেন তিনি। সামনে প্রতিপক্ষ বিশাল বাহিনী। গুলি ছুড়ছে বৃষ্টির মতো। এক সময় শত্রু সৈন্যরা ঘিরে ফেললো মুজাহিদদের। হঠাৎ তাদের একটি গুলি এসে লাগলো সৈয়দ সাহেবের বুকে। তপ্ত রক্ত বেরিয়ে এলো। রঞ্জিত হলো বালাকোটের মাটি। সাথে সাথে শহীদ হলেন তিনি। স্বর্ণ– শোভিত সেই দিনটি ছিলো ১৮৩১-এর ৬ মে।

❖ ❖ ❖

## সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ১৯৭১-এ, সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ থানার তারালী ইউনিয়নের জাফরপুর গ্রামে। পিতা মোঃ আহছান আলী সরদার। মাতা মোছাঃ নূর নাহার। ১৯৮৮-তে এস.এস.সি., ৯০-তে এইচ.এস.সি এবং ১৯৯২-তে স্নাতক হন। বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত।

সাহিত্যের ভুবনে তাঁর পদচারণা জীবনী লেখক হিসেবে। প্রকাশিত বই 'মুন্সী এফাজতুল্যার (রহ) জীবন কথা' (১৯৯৯) ও 'সাতক্ষীরায় ইসলাম (২০০৪)। 'মাসিক মদীনা', 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা', 'দৈনিক দৃষ্টিপাত', 'দৈনিক যুগের বার্তা', 'দৈনিক আলোর পরশ'-এ বিভিন্ন সময়ে তাঁর ইসলামী জীবন, ঐতিহ্য ও আদর্শ ভিত্তিক প্রবন্ধ বের হয়েছে।

বর্তমান বই-এ বদর থেকে বালাকোট পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের সামরিক সংঘর্ষগুলো কথা সাহিত্যের আঙ্গিকে দেখানো হয়েছে।

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com